[আমাদের ছুটি - ২১শ সংখ্যা]

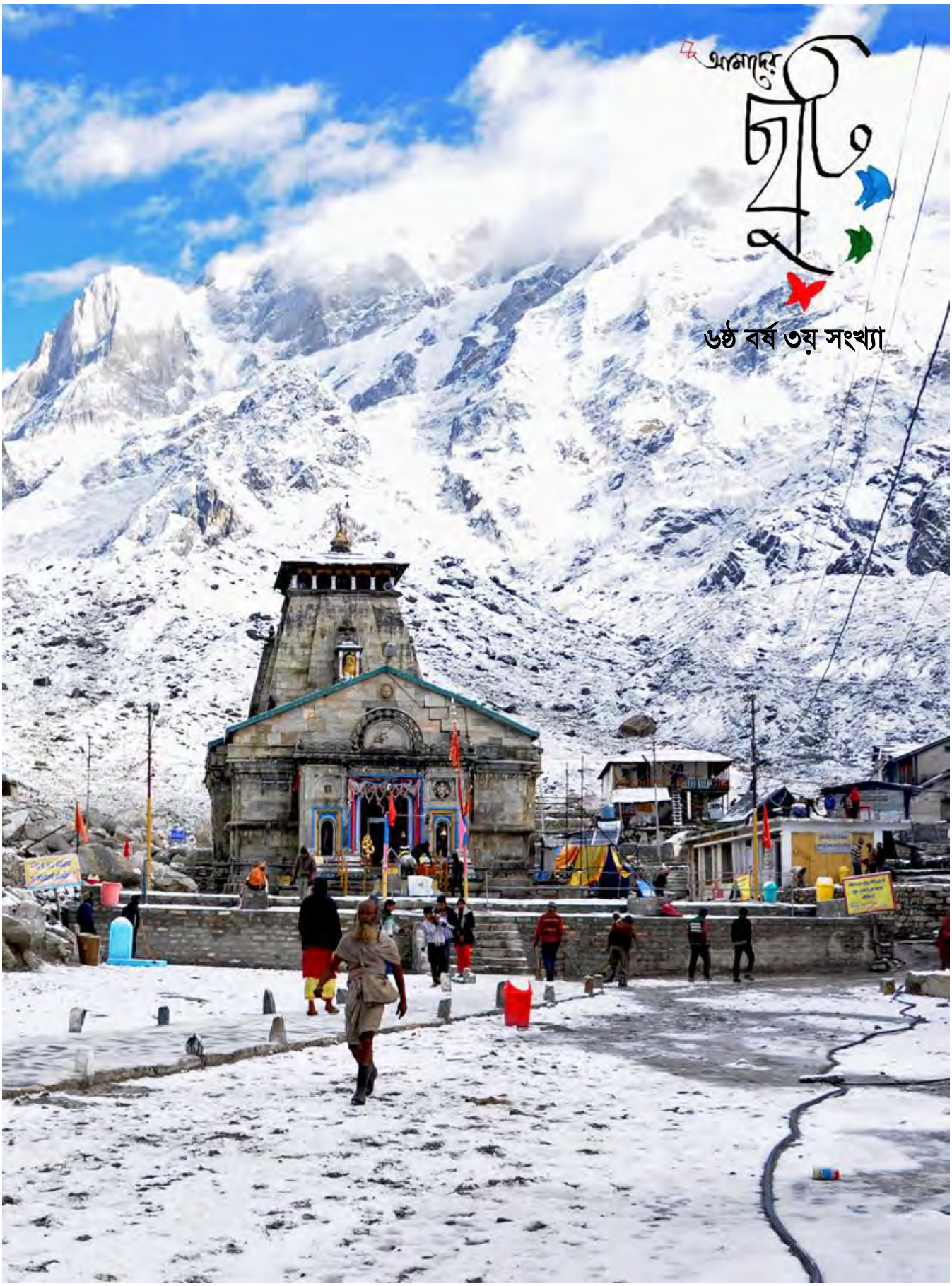

তুষারাবৃত মন্দিরমার্গ, কেদারনাথ - আলোকচিত্রী- সুমন্ত মিশ্র

আমাদের ছুটি - ২১শ সংখ্যা

~ ৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা - কার্তিক ১৪২৩ ~

আর সব শারদীয়া বেরিয়ে গেল, 'আমাদের ছুটি'-র এত দেরি কেন লেখক-পাঠকদের থেকে এমন অনুযোগ প্রায়ই পাচ্ছি। পত্রিকা পড়ার জন্য এই আন্তরিক আগ্রহ ভালো লাগছে আমাদেরও। পত্রিকাটি বছরে চারটে সংখ্যার বেশি প্রকাশ করে উঠতে পারি না আমরা -বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক আর মাঘে। তাই বর্ষার পরে অক্টোবরের শেষাশেষি বা নভেম্বরের শুরুতে পত্রিকার নির্ধারিত সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়। অনেক শারদ সংখ্যা তো এখন জুলাই মাস থেকেই পড়া শুরু হয়ে যায়। হেমন্তের মনকেমন করা বিকেল-সন্ধ্যার অবসর না হয় খানিক কাটিয়ে তুলুক 'আমাদের ছুটি'।

বেশ কিছুকাল ধরেই 'আমাদের ছুটি'র পাতায় পুরোনো বাংলা ভ্রমণকাহিনির স্বাদ পাচ্ছেন পাঠকপাঠিকারা। সেই ইতিহাস উদ্ধার পর্বের শুরুটা প্রকাশিত হল এবার ছাপার অক্ষরেও। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি ভারতবর্ষে রেলপথ চালু হয়। তার আগে বাঙালি মেয়ে তীর্থে বেরোলেও তার কোনও লিখিত দলিল চোখে পড়ে না। আঠারোশ সত্তরের দশকে এক বাঙালি তরুণী 'বম্বাই' বেড়াতে গিয়ে লিখল তার ভ্রমণকাহিনি - 'আমাদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত'। লেখিকার নামের উল্লেখ ছিল না। অবশ্য তার আগেই আঠারোশ ষাটের দশকে 'বামাবোধিনী' পত্রিকা প্রকাশের তিনমাসের মধ্যেই কবিতায় তাঁর ভ্রমণকথা লিখেছিলেন রমাসুন্দরী।

একবিংশ শতকের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের এক মফঃস্বলী মেয়ে লিখতে শুরু করেছিল ভ্রমণকাহিনি। নিজের বেড়ানোর কথা লিখতে লিখতে আর ভ্রমণপত্রিকার সম্পাদনা করতে করতে তার মনে প্রশ্ন জাগে আমার আগে কারা লিখেছিল বেড়ানোর গল্প, কোথায় গেল সেইসব লেখা?

এর উত্তর খুঁজতে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে, বইমেলায়, আন্তর্জালের অলিগলিতে এবং আরও নানা সম্ভাব্য, অসম্ভাব্য জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে গড়ে ওঠে আরেক ভ্রমণকাহিনি - 'আমাদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত - ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গমহিলাদের ভ্রমণকথা'। উনিশ শতকের বাঙালি নারীদের বাড়ির বাইরে বহির্বিশ্বের আঙিনায় পা রাখার গল্প উঠে আসে একুশ শতকের বাঙালি মেয়ের কথায় ও তাদের লেখা 'কাহিনি'তে।

এরই প্রথম পর্ব প্রকাশিত হল 'গাঙচিল' প্রকাশনা থেকে। অসংখ্য ধন্যবাদ প্রকাশক অধীরদাকে।

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

এই সংখ্যায় -

একদিকে মাটি-পাথরের পাহাড়ের দেওয়াল আর অন্যদিকে দূরে পাহাড়ের মাথায় বরফের চূড়া। একেকটা জায়গায় ন্যাড়া পাহাড় পাথুরে রঙিন, একেক জায়গায় বালির মতো হলদেটে। সবুজে হলুদে লালে ঝলমলে গাছের পাতা বাতাসে কাঁপছে। সিন্ধু বয়ে চলেছে ওরই কোল ঘেঁষে। তার বিস্তীর্ণ উপত্যকা - একপাশে রুক্ষ, অন্যদিকে সবুজ। হোটেলের বাগানে আপেলগাছে লাল-সবুজ আপেলের ভিড়। সদ্য চেনা, এমন কী অচেনা মানুষও দেখা হলে হাসিমুখে বলে ওঠেন, 'জুল্লে'। তবু ঠান্ডার গায়ে বিষণ্ণতার একটা আঁচল জড়ানো থাকে। হলুদ ম্যাপেল পাতা ঝরায় আর পাহাড়ি মানুষের জীবনযাপনে কোথাও সে বিষণ্ণতা লেগে থাকে যেন।

- দময়ন্তী দাশগুপ্তের কলমে ধারাবাহিক ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র - লাদাখ পর্ব-এর প্রথম পত্র

আমাদের ছুটি - ২১শ সংখ্যা

~ আরশিনগর ~

এবার মেদিনীপুর - তপন পাল

ত্রিবেণী তীর্থ পথে - উদয়ন লাহিড়ি

~ সব পেয়েছির দেশ ~

ভালো থেকো কেদার - সুমন্ত মিশ্র

সুন্দরী রুপিনে - ঝুমা মুখার্জি

চন্ডীগড়ের কল্পনগরীতে - অতীন চক্রবর্তী

~ ভুবনডাঙা ~

দানিয়ুবে নৌকাবিহার - সৌমিত্র বিশ্বাস

আলাস্কার অন্দরে - সচ্চিদানন্দ দত্ত

স্মৃতিতে শ্যামদেশ - শ্রাবণী ব্যানার্জি

~ শেষ পাতা ~

দেবভূমির পবিত্রতায় - অয়ন দাস

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com

© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনি

ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র - লাদাখ পর্ব

দময়ন্তী দাশগুপ্ত

~ *লাদাখের আরও ছবি* ~

প্রথম পত্র

বন্ধুবর,

অপার্থিব কিছু পাওয়ার জন্য ভয়াবহ এক পার্থিব দৌড়ের গল্প দিয়েই আমার এই পত্রাঘাত শুরু করি। লাদাখ জায়গাটা তো এমনিতেই শহুরে আমাদের চেনাজানা দুনিয়ার বাইরে, তার ওপরে আমার ভোদাফোনের টাওয়ার অর্থাৎ বাকি পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না, কাজেই অপার্থিব ভাবাটা ঠেকাচ্ছে কে? মাঝে মাঝে হোটেলে অবশ্য ফ্রি ওয়াই-ফাই পেয়ে ছিলাম, ওই যাকে বলে বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছ...!
যাকগে যা বলছিলাম, ১২ অক্টোবর, ২০১৫ ভোর তিনটেয় উঠে তৈরি হয়ে জে এন ইউ-এর গেস্টহাউস থেকে দিল্লি এয়ারপোর্টের দিকে রওনা গাড়িতে। পৌঁছে বিস্তর চেকিং-এর হ্যাপা শেষ করে সবে টয়লেট থেকে বেরিয়েছি, ওমা শুনি এয়ার ইন্ডিয়ার থেকে ফোন করে জানতে চেয়েছে আমরা কোথায়! তখনও প্রায় আধ ঘন্টা বাকি। দেখি আমরা আছি তিরিশ নম্বর টার্মিনালের কাছে আর প্লেন ছাড়বে ষাট নম্বর থেকে। বোঝো ঠেলা! সিকিওরিটি চেকের সময় বু আর বুই দুজনেরই ভারী ভারী জুতো খুলিয়ে ছেড়েছে, বাব্বা বাব্বা, জুতোর ফিতে বাঁধার সময়টুকু তো দেবে! মালপত্র নিয়ে দৌড় দৌড় দৌড়। ওই যে, প্লেন ধরা সহজ নয়। সবার আগে দীপ আর সৌম্য। দীপের মোবাইলে মাঝে মাঝেই এয়ার ইণ্ডিয়ার তরফ থেকে মালপত্র নামিয়ে দেওয়ার হুমকি আসছে। যাই হোক, আমি আর মেয়ে কোথাও দাঁড়াইনা, এমনকী চলমান পথের থুড়ি এসকালেটরের ওপর দিয়েও দৌড়াই প্রাণপণে। লড়ঝড়ে শরীরে ব্যথা জানান দেয় এদিকে সেদিকে, সে ভাবার সময় নেই ৩৫-৩৬...৪২-৪৪...৫৬-৫৮...ওই এসে গেল প্রায়..৫৯-৬০...উফফফফ..., বুই আর আমি পৌঁছেও যাই হাঁপাতে হাঁপাতে। চিন্তা শুধু বীরেনকে নিয়েই। বুকে যন্ত্র বসানো, ওর না আবার শরীর খারাপ করে। শুনি দীপ আর সৌম্যের সঙ্গে এয়ার ইন্ডিয়ার কাউন্টারের লোকজনের হিন্দিতে গরমাগরম বাতচিত চলছে। আমিও লালমোহনীয় হিন্দিতে যোগ দিই। আরে, আপনারা যখন ফোন করেছেন, তখন তো আমরা এদিকেই আসছিলাম, কে জানত দিল্লি এয়ারপোর্ট এত লম্বা! আর আমাদের সঙ্গে একজনের বুকে পেসমেকার বসানো আছে, কতটা তাড়াতাড়ি আসা সম্ভব? ওরাও হুমকি দেয় আপনাদের জেনে রাখা উচিত ছিল, এখনই বাকীরা না পৌঁছালে মালপত্র সব নামিয়ে দেব। যদিও কুড়ি মিনিট আগেই গেট বন্ধ হওয়ার কথা, কিন্তু প্লেন ছেড়ে যাওয়ার তো তখনও দশ মিনিটের বেশি বাকী রয়েছে। এ যেন আমাদের শঙ্করীদি, বৌদি তাড়াতাড়ি বল কী রান্না হবে, হুড়মুড়িয়ে রান্না করে সময়ের আগে সব্বাইকে খাইয়ে দিয়ে বাসনটা মেজে ফেললেই ব্যস, কাম ফতে।
যাইহোক, দূরে বীরেন, টুসি আর বু-কেও দেখা যায়। আমরা উৎসাহিত গলায় বলি, ওই তো এসেই গেছে, কাউন্টারের লোকদুটিও গজগজ করতে করতে ক্ষান্ত দেয়। পৌঁছে বীরেন হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, আমি তো ভাবলাম আর ধরতেই পারব না। প্রায় হয় প্লেন নয় প্রাণ গোছের অবস্থা আর কী। দীপ আশ্বাস দেয়, আরে এখনও প্লেন ছেড়ে দেওয়ার টাইম তো হয়নি, আমাদের কাছে টিকিট আছে, উঠতে দেবে না মানে? আমাদের লাগেজ খুঁজে পেতে নামাতে আরও দশ মিনিট তো লেগেই যেত, আর ইতিমধ্যে আমরা উঠে পড়লে আবার লাগেজও ওদের ওঠাতেই হতো। অতএব...। যাইহোক আমরাও টপাটপ প্লেনে চড়ে বসি আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্লেন রানওয়ে দিয়ে গড়াতে শুরু করে।
দাঁড়াও, আগের কথা আগে সেরে নিই, তোমাকে তো বলেইছিলাম যে, অনেকদিন ধরেই আমাদের লাদাখ বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা চলছিল, মানে চলেই যাচ্ছিল। যেবারে প্রায় সব ঠিকঠাক, তখনই বীরেনের বুকে পেসমেকার ধরণের যন্ত্রটা বসল আর তাই প্ল্যান থমকে গিয়েছিল। মুশকিল হচ্ছে, ইদানীং বীরেনের বক্তব্য, যন্ত্র দিয়ে আর কতদিন চলবে, তাই নাকি ওর হয়তো আর লাদাখ দেখা হবে না। অতএব ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেটলে সব ফাইনাল করা হল। বেশি হাঁটাহাঁটি বা সিঁড়ি ভাঙা চলবে না, নিজের শরীর বুঝে বাকিটা। ওদিকে যাওয়ার দিন যত কাছে আসে আমার নিজের শরীরগতিক ততো খারাপ হতে থাকে। কিন্তু না, ক্যানসেল করলে বীরেন ভারী কষ্ট পাবে। নিজেকে তাই বলি, ওঠো হে।
তা উঠেই পড়ি অক্টোবরের দশ তারিখ বিকেল চারটে নাগাদ রাজধানী এক্সপ্রেসে। সেই কোন ছোটবেলায় আনন্দমেলায় সমরেশ বসুর লেখা গোগোলের অ্যাডভেঞ্চার 'রাজধানী এক্সপ্রেসের হত্যারহস্য' পড়ে রাজধানী এক্সপ্রেসে চাপবার সখ হয়েছিল, তা এ্যাদ্দিনে পূরণ হল। ভাগ্যিস, দীপের এল টি সি ছিল, আরও ভাগ্যিস, আমি মনে মনে বড় থুড়ি হোৎকা হয়ে যাইনি, তাই ছোটবেলার মতোই মজা পেলাম। ট্রেনে ডায়েরি লিখিনি, চলমান জানলার পাশে বসে স্রেফ খান দুয়েক কবিতা।

দিল্লি পৌঁছে গাড়ি ভাড়া করে জে এন ইউ-এর দিকে রওনা। ওখানকার গেস্টহাউসে আমাদের জন্য ঘর বুক করে রেখেছিল আমার হস্টেলের বন্ধু পালু, অর্থাৎ শর্মিষ্ঠা পাল। এই প্রথম স্যুইটে থাকলাম সেও এক ছেলেমানুষি মজা আর কুড়ি বছর পর আরও এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা সেও দারুণ মজার।
আমাদের ঠাঁই হল আরাবল্লী ইন্টারন্যাশনাল গেস্টহাউসে। অদূরে অন্য একটা বাড়ির একতলায় ডাইনিং হল - গেস্টরা তো বটেই, অনেক ছাত্রছাত্রী তথা শিক্ষকেরাও খেতে আসেন। দুপুরের খাওয়ার পালা শেষ করতে না করতেই পালু, শোভন আর ওদের ছোট্ট ছেলে 'ধিঙ্গিপদ' ওরফে সৌরাংশু

হাজির। ছোট বেগুন দিয়ে মাখোমাখো তরকারিটা দিব্যি হয়েছিল। দুপুরের গনগনে রোদের মধ্যেই ওদের সঙ্গে পার্থসারথি রকে গিয়ে ঘোরাঘুরি হল। সেখান থেকে নেমে ওরা কোয়ার্টারে ফিরে গেল, আমরা চললাম অটোতে চেপে কুতুব মিনার দর্শনে।

পার্থসারথি রকে - প্রাচীন আরাবল্লী পর্বতের রেশ

ইতিহাসের আনাচে-কানাচে ঘুরতে ঘুরতে মাথা আক্ষরিক অর্থেই ঝিমঝিম। সন্ধ্যাবেলায় পালুদের বাড়িতে স্ন্যাকসের নেমতন্ন, ও নানারকম খাবার বানাতে খুব ভালোবাসে। চন্দনদা বলে, চল স্নেক (স্ন্যাকস্-এর সংক্ষিপ্তকরণে) খেয়ে আসি। পালুর বাড়ি পৌঁছে মাথায় জল ঢালি হুড়মুড়িয়ে, তারপরে বিছানায় বেশ খানিকক্ষণ গড়াগড়ি দিই। তারপর ওর বানানো ফিস ফ্রাই আর দুরকমের কেক খেয়ে ক্রমশঃ চাঙ্গা হই। ওরই মধ্যে বীরেন টুসিকে

বিকেলের রোদ্দুর গায়ে মেখে কুতব মিনার

বলে দারুণ এই ফিসফ্রাইটা বানানো শিখে নিতে, নিরামিষাশী চন্দনদা চুমকিকে পালং শাকের নিমকির রহস্য শিখে নিতে উৎসাহ দেয়। আর আমি বলি, এসবের থেকে এমন বন্ধু থাকাটাই ভালো নয় কি যে সবই বানাতে পারে, একটু কষ্ট করে শুধু তার ঠিকানায় পৌঁছে গেলেই হল। পেট প্রায় ভরাই, তাই রাতের খাওয়ার জন্য কেউ আর নড়তে রাজি হল না, শোভন, বীরেন আর দীপ গিয়ে কাছের ধাবার থেকে খাবার নিয়ে আসে। এত খাবার শেষও হয়না। খাওয়ার শেষে নিজের চারচাকায় দফায় দফায় আমাদের গেস্টহাউসে পৌঁছে দেয় শোভন। আসলে জে এন ইউ-এর চত্বরটা এত বড় যে হেঁটে যাওয়ার জন্য অনেকটাই। ভারী ভালো লাগে সবুজ গাছে ছাওয়া বিস্তীর্ণ এলাকা। বুইকে বলি, ভালো করে পড়াশোনা কর, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন পড়তে যদি আসতে পারিস। তবে বুইয়ের আকর্ষণ পড়াশোনা নয়, ধিঙ্গিপদ - মা ভাইটা কি মিষ্টি না? আমার প্রায় সতের বছরের মেয়ে বলে। ভাইয়ের সঙ্গে তার বড্ড ভাব হয়ে গেছে। ওদিকে জে এন ইউ ক্যাম্পাসে কুড়িয়ে পাওয়া ময়ূরীর পালক তার টুপিতে গোঁজা। সেটা নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে কাড়াকাড়িও চলে রীতিমত।

এতো গেল আগের কথা। তারপরে তো ১২ তারিখ মহালয়ার ভোররাতে উঠে মোবাইলের স্পিকারে 'জাগল তোমার আলোর বেণু' শুনতে শুনতে এয়ারপোর্টে পৌঁছে শেষঅবধি রোক্‌কে রোক্‌কে বলে আমরা প্লেনে চেপে পড়লাম সদলবলে। সদলবলে মানে, আমরা তিনজন, তাছাড়া বীরেন, টুসি, বু আর সৌম্য - সবাই এক-একটা জানলার পাশে। চুমকি- চন্দনদার ফ্লাইট আলাদা – ছাড়তে এখনও খানিক দেরি আছে। দীপের এল টি সি-র কল্যাণেই আমার যা একটু-আধটু প্লেনে চড়া। প্লেনে উঠলেই নিজেকে কেমন বুড়ো আঙলার রিদয়ের মতো লাগে। সেই হাঁসের পিঠ থেকে দেখা খেলনার মতো ছোট্ট ছোট্ট বাড়িঘর, সবুজ চৌখুপি ক্ষেত, নদী আর রাস্তার দাগ। ওপর থেকে পৃথিবীটাই এত ছোট হয়ে যায় যে মনে হয়, মানুষ মিথ্যেই শুধু নিজেদের মধ্যে হানাহানি, কাটাকাটি করে, পুরোটাই কী বিষম অর্থহীন। লাদাখ-কাশ্মীর বেড়ানোর সময় প্রায়ই এই কথাই মনে হয়েছে মিলিটারি সেনা আর সাধারণ মানুষদের জীবন দেখতে দেখতে।

মেঘেদের রাজ্যে রোদের ঝলক পেরিয়ে যেতেই চোখে পড়ে নীচে যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে এমন দূরত্বে শ্বেতশুভ্র কারাকোরাম পর্বতমালা। কোনও পাহাড়ের মাথায় বরফের সাদা চাদর, কারোর বা মেঘের। মেঘ আর বরফ মিলেমিশে রোদ-ছায়ায় সে এক অপরূপ দৃশ্য। শুধুই মুগ্ধ হওয়া।

হিমবাহের যাত্রা শুরু - আকাশপথে দেখা কারাকোরাম পর্বতমালা

প্লেন থেকে নেমে লেহ্-এর লাউঞ্জেই আমরা গড়াগড়ি যাই। বাপরে কী ঘুম পাচ্ছে, ওদিকে এয়ারপোর্টের মাইক্রোফোনে ঘনঘন নানা সতর্কবাণী ঘোষণা হচ্ছে যারা আমাদের মত আচমকা সমতল থেকে উড়ে এই দশ হাজার ফিট ওপরে উঠে এসেছে অ্যাক্লামাটাইজেসন তাদের কি করা উচিত আর অনুচিত সে ব্যাপারে। বিভিন্ন জায়গায় লেখা রয়েছে প্রথমদিন দিনের বেলায় ঘুমাবেন না। কী জ্বালা! একটু ঘুমোতেও দেবে না ছাই। বসার সোফাতেই হাই তুলতে তুলতে গুটিসুটি হই শীতে আর ঝিমুনিতে। চন্দনদাদের প্লেন আরও কিছুক্ষণ পরে পৌঁছাবে, ফলে অপেক্ষা আর অ্যাক্লামাটাইজেসন দুটোই একসাথে হতে থাকে। চন্দনদারা পৌঁছালে এয়ারপোর্টের বাইরে পা রাখতেই লেহ্-এর রুক্ষ্ম সৌন্দর্য মুগ্ধ করে আমাদের। কিন্তু দেখি একটাও গাড়ি নাই। যে কটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল সবই আগে থেকে বুক করা, এরোপ্লেনের অন্য যাত্রীরা একফলে আবারও অপেক্ষা এবং নিজেদের পোঁটলাপুঁটলি হাতড়ে বিস্কুট, চিঁড়ে, ছোলা ভেজানো, কোল্ড ড্রিঙ্কস এসব খাওয়া। বাপরে কী ভীষণ খিদে পেয়েছে। আমার তো প্লেনেই পাশের লোকটা না খেয়ে প্লেট ফেরত দিচ্ছে দেখে ওর খাবারটাই খেতে ইচ্ছে করছিল, নেহাত চক্ষুলজ্জার খাতির! তবে

আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত যে যেরকম খিদে আর ঘুম পাচ্ছে তাতে আমরা নিশ্চয় অলরেডি অ্যাক্লেমাটাইজড।
অবশেষে গাড়ি পাওয়া গেল। আমাদের ড্রাইভারের নাম থুড়ি টাইটেল তুন্ডুপ। লেহ্-এর নেড়া পাহাড় আর লাল-সবুজ-হলুদ রঙিন গাছের রূপ দুচোখ ভরে দেখতে দেখতে মূল বাজার চত্বর পেরিয়ে ওল্ডফোর্ট রোডে পৌঁছাই। অক্টোবরের পাতা ঝরার সময় বলেই প্রকৃতির এত বিচিত্র রূপ। এবার হোটেলের সন্ধান করতে নামে দীপেরা। আর তুন্ডুপ গল্প জোড়ে আমার সঙ্গে - হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করে, আপনারা নমস্তে-কে কী বলেন? আমি বলি, নমস্কার। তুন্ডুপ হাসিমুখে বলে, নমস্কার, নমস্কার, জুল্লে জুল্লে। আমরাও বলি, জুল্লে। লাদাখে দিন কাটাতে কাটাতে ক্রমশঃ জানতে পারি, গুড মর্নিং, গুড ডে থেকে গুড বাই সবই ওদের কাছে, 'জুল্লে'। পথেঘাটে সব জায়গায় লেখা থাকে, 'জুল্লে' আর সর্বত্র চেনা-অচেনা লোকজনেরা দেখা হলে হাসিমুখে বলে ওঠেন, 'জুল্লে'। এই মায়াময় শব্দটা তাই বড় ভালো লেগে যায় আমার।

হোটেল থেকে দেখা লেহ্ প্যালেস ও সেমো গুম্ফা

হোটেল ঠিক করে মালপত্তর তুলে ঘরে ঢুকে একটু ফ্রেশ হয়ে নিতে প্রায় দুপুর। হোটেল 'বিমলা', উচ্চারণ হবে বিম্‌লা। মালকিনের মেয়ের নামে। কেয়ারটেকার ধনগিরির সঙ্গে ক্রমশঃ আলাপ জমে ওঠে। ছেলেটি একেবারে বিভূতিভূষণের লেখা থেকে উঠে আসা একটি চরিত্র। এর কথা পরে লিখছি। তিনতলায় সিলিং অবধি কাচের জানালায় মোড়া চারটে ঘর। ঝলমলে দিন, ঘর থেকেই দেখা যায় একপাশে লেহ্ প্যালেস আর অন্যদিকে বরফে ঢাকা পাহাড়ের সারি স্তোক-কাংরি। হোটেলের বাগানে আপেল গাছে লাল-সবুজ আপেলের ভিড় নজর এড়ায় না কারোরই। ঢুকেই রিসেপশনের আগে বাইরে টেবিলের ওপরে রাখা একটু পোকায় কাটা কী দাগ লাগা বাতিল আপেল দিয়ে আমাদের আপেল খাওয়া শুরু হয়, তারপরে বীরেন হাত বাড়ায় গাছের দিকে। তবে আপেল পর্বও বিরাট, তাই ক্রমশঃ প্রকাশ্য। আপাতত এদিন বিশ্রাম, শরীরের সঙ্গে উচ্চতাকে মানিয়ে নেওয়া আর বেড়ানোর পরিকল্পনা ঠিকঠাক করে ফেলতে গাড়ির সঙ্গে দরাদরি। অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহ, লাদাখের সিজন শেষ, তাই হোটেল, গাড়ি আগে থেকে কিছুই ঠিক করে রাখা হয়নি, পৌঁছে যা কিছু করা যাবে, ভিড় তো নেই, এই ভরসায়।
আসল বেড়ানোর শুরু হবে পরদিন থেকে, আমার ডায়েরিরও। সন্ধ্যায় 'আমাদের ছুটি'-র সুবীরদার রেফারেন্সে যোগাযোগ হওয়া হাসানের সঙ্গেই কথা পাকা হয়, টেম্পো ট্র্যাভেলার - চৌদ্দ জনের সিটে আমরা ন'জন আর মালপত্তর। জানা যায় ড্রাইভার যে থাকবে তার নাম মানে টাইটেলও তুন্ডুপ!
এবারে ডায়েরির পাতায় চোখ বুলাই। বেশিটাই লিখেছি পথে, গাড়ির ঝাঁকুনি খেতে খেতে, তাই নিজের হাতের লেখা নিজের কাছেই দুর্বোধ্য এখন। উদ্ধারের একটা চেষ্টা করে দেখা যাক। এই ডায়েরি লেখার ঠেলায় এবারে একপাটি গ্লাভস হারিয়েছি। খোদ ডায়েরিটাও বার দুয়েক অন্ততঃ হারাতে হারাতে কান ঘেঁষে বেঁচে গেছে। আর আমার ঘড়ির ব্যান্ড লুজ হয়ে যাওয়ায় পরের দিকে কটা বাজে বলে সব্বাইকে বিস্তর জ্বালিয়েছি। চন্দনদাই বোধহয় মন্তব্যটা করেছিল, তুমি তো দেখছি প্রফেসর শঙ্কুর মতো ডায়েরি লিখছ। অনেকসময় কেবল নোট রেখেছি, সেগুলোও ঠিকঠাক করে দাঁড় করাতে হবে। তবে দীপ আমার লেখার পরিমাণ দেখে বলেছে, এই যা লিখেছ, এটাই তো ঢের হয়ে গেছে। সে যাইহোক...

১৩/১০/২০১৫
বেলা সোয়া ১১টা। সিন্ধুঘাট অথবা সিন্ধুদর্শন সাইট
একদিকে মাটি-পাথরের পাহাড়ের দেওয়াল আর অন্যদিকে দূরে পাহাড়ের মাথায় বরফের চূড়া। সবুজে, হলুদে, লালে ঝলমলে গাছের সারি। বিন্দুসম সিন্ধু বয়ে চলেছে। আগে আরও খানিক ভেতরে যাওয়া যেত, দীপ দেখায়, এখন ব্রিজ ভেঙে গেছে। একটু দূরে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে বিশাল পোঁটলা কাঁধে এক বাবা নামে, সঙ্গে দুই মিষ্টি মেয়ে নিজেদের থেকে বড় ব্যাগ দুহাতে নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে পাথর পেরোয়। আরেক মিষ্টি বাচ্চা কোলে নিয়ে এবার মা গাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ায়। আরও একজন পুরুষ রয়েছে, সেও বেরিয়ে আসে। আমি বাচ্চাটাকে দেখেই ভারী খুশি হয়ে আদর করি। ওদিকে বাবা আর মেয়েরা জল পেরিয়ে একটা বড় পাথরের ওপর কাপড়ের বোঝাগুলো নামিয়ে রাখে। কাচবে কি? দেখা বা জানা হয়না, তুন্ডুপ ভাইয়া তাড়া লাগায়, আমরাও গাড়িতে উঠে বসি।
এরপর গন্তব্য ড্রুক হোয়াইট লোটাস স্কুল - আমির খান অভিনীত 'থ্রি ইডিয়টস' খ্যাত র‍্যাঞ্চোর স্কুল। আমি নামি না। এই একা নিস্তব্ধতায় বসে থাকতেও ভালো লাগছে। ঘুম পাচ্ছে বরফ পাহাড়ের মাথায় রোদ ঝলসানো দেখতে দেখতে। শরীরটা বেশ খারাপই লাগছে। রবি ঠাকুরের কবিতার একটা লাইন মাথার মধ্যে ঘুরেফিরে আসছে - যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।

বেশ চড়চড়ে রোদ্দুর। অন্যদের কাছে অস্বস্তিকর হলেও আমার বেশ আরাম লাগছে। গা-হাত-পা ব্যথায় ভেঙে আসছে। আরও দুটো গাড়ি এসে দাঁড়াল। জানলার ধারে বসে এলোমেলো লিখছি। এবারে এলোমেলো লিখবই ঠিক করেছি, যা মনে আসবে তাই।
হলুদ-সবুজ পাতায় বাতাস লেগে কাঁপছে, কাছে গেলে হয়তো মর্মরধ্বনি শোনা যেত। কিন্তু নামতে ইচ্ছে করছে না, খুব ঘুম পাচ্ছে। মনটা কেমন প্রশান্ত লাগছে পাহাড় আর গাছেদের সান্নিধ্যে।
গতকাল নীল আকাশে মাঝেমাঝেই সাদা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছিল, আজ মেঘ নেই। এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে কখনও।
এই প্রকৃতির মধ্যে একটা লোনলিনেসের ফিলিংস আছে। অন্ততঃ আমার কাছে। অথবা নিস্তব্ধতা, কে জানে!
স্কুলের আগে পরপর অনেকগুলো চোর্তেন ছিল, সমাধিভূমি আর কী। বেশ অদ্ভুত না, স্কুল, চোর্তেন, পাহাড়, নিস্তব্ধতা সব পাশাপাশি। এবারে

মনে হচ্ছে, ভ্রমণ মানে শুধু দেখা নয়, গভীর অনুভূতিও, হোয়াট আই ফেল্ট।
আপেল খাচ্ছি। বিম্‌লা হোটেলের বাগানের মিষ্টি আপেল। বাইরে রোদ্দুর ঝলসাচ্ছে।

দুপুর ১২.০৫। থিকসে মনাস্ট্রি

ন্যাড়া পাহাড়ের ওপর থিকসে মনাস্ট্রি। মুখোমুখি বরফ পাহাড়। ১৪৫টা সিঁড়ি ভেঙে উঠি। নামবার সময়ে বুই গুণেছিল। সিঁড়ির মাথার কাছে পাহারাদার দুটো সিংহ মূর্তি। এই মনাস্ট্রির মূল আকর্ষণ ভেতরে দোতলাসমান মৈত্রেয় মানে ভবিষ্যৎ বুদ্ধ আর বাইরে দাঁড়িয়ে ওপর থেকে উপত্যকার বিস্তীর্ণ সৌন্দর্য। আমার কিন্তু চোখ টেনেছিল অদ্ভুত মূর্তিগুলো।
আগে এই মনাস্ট্রির পেছনের গল্পটা বলে নিই দাঁড়াও।
বারো তলা উঁচু এই মনাস্ট্রিটা তৈরি হয়েছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে 'হলুদ টুপি' বা গেলুগ ধারার প্রবক্তা জে সোংখাপা তাঁর ছ'জন অনুগামীকে লাদাখে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। এই ছ'জনের মধ্যে শেরাব সাংপোর হাতে তিনি অমিতায়ুস বুদ্ধের একটি ক্ষুদ্র মূর্তি দিয়ে লাদাখের রাজার সঙ্গে দেখা করতে বলেন। রাজা তখন শ্যে প্যালেসে থাকতেন। মূর্তিটি পেয়ে উৎসাহিত হয়ে তিনি মনাস্ট্রি প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক সহযোগিতা করেন। 'হলুদ মন্দির' নামে পরিচিত ছোট গুম্ফাটি তৈরি করা হয়েছিল সিন্ধু নদের উত্তরে। পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে শেরাবের ছাত্র পালদেন মনাস্ট্রিটিকে বড় করে বানাবার উদ্যোগ নেন। গল্পকথা বলে, সোংখাপার ভবিষ্যৎবাণী ছিল, সিন্ধু নদের দক্ষিণ পাড়ে তাঁর ধর্মের প্রভাব বিস্তার হবে। থিকসে মনাস্ট্রির প্রতিষ্ঠা এবং পরবর্তীকালে স্পিতুক ও লিকির মনাস্ট্রি গড়ে ওঠায় তাঁর এই আশা সত্যি হয়। সেও আরেক গল্প - শেরাব আর পালদেন সাংপো পুজোআচ্চার সময় বুদ্ধকে উৎসর্গীকৃত 'তোরমা' ছুঁড়ে দিতে যাবেন, ঠিক সেইসময় দুটো কাক এসে পাত্রটি নিয়ে পাহাড়ের অন্য পাড়ে উড়ে যায়। তোরমাটি শেষপর্যন্ত থিকসেতে একটি পাথরের ওপর সযত্নে অক্ষত অবস্থায় খুঁজে পান পালদেন ও তাঁর অনুগামীরা। দৈব নির্দেশ মনে করে থিকসেতেই তাই মনাস্ট্রি গড়ে তোলেন পালদেন।

থিকসে মনাস্ট্রি

সোনালি রঙের দোতলা সমান উঁচু বিশাল মৈত্রেয় বা ভবিষ্যৎ বুদ্ধমূর্তি যে ঘরে তার বাইরের ঘরটায় মাঝে শাক্যমুনি বুদ্ধ মূর্তির দু'পাশে দুই প্রহরী। এই বুদ্ধের বাঁয়ে ডাইনে সবই মেডিসিন বুদ্ধ। বসে থাকা অবস্থার মূর্তিগুলির সবারই কোলের কাছে রাখা হাতের ওপর ওষুধের পাত্র। একেকজনের বিচিত্র সব নাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। মৈত্রেয় বুদ্ধের হাতেও ওষুধের পাত্র।
মৈত্রেয় বুদ্ধমূর্তির বাঁয়ে বেশ কয়েকটা অদ্ভুত দেখতে মূর্তি রয়েছে। এগুলো তান্ত্রিক বৌদ্ধমূর্তি। নারী-পুরুষের মিলিত মূর্তি - বুদ্ধ-শক্তির। প্রথমটি বসা ভঙ্গিমা। সম্ভবত দশটা মাথা। ছটা মাথা চোখে পড়ল। সামনের নীল রঙের দেহটি নারীর, পিছনে কালো দেহটি পুরুষের। একেকটা মাথা একেক রঙের - লাল, সাদা, কালো ইত্যাদি। অজস্র হাত, দশটা গুনতে পারলাম। একেকটা হাতে একেকরকম অস্ত্র। মূর্তিটির নাম ইংরেজি হরফে লেখা আছে - গুহ্যসমাজ। তথ্যে রয়েছে, যোগ তন্ত্রের সর্বোচ্চ ধাপের বজ্র পরিবারের এই মূর্তিটি যে গুণ তৈরি করে তা ক্রোধ পরিবহন করতে পারে। বুঝলাম এ আমার জন্য।এর বাঁ পাশের মূর্তিটি দাঁড়ানোর ভঙ্গীমায় নারী-পুরুষ আলিঙ্গনরত। নারী মূর্তিটির লম্বা বাদামী চুল, দেহ লাল, মুখ দেখা যাচ্ছে না। পুরুষ মূর্তিটির দেহ কালো, দুটি মাথা হলুদ ও সবুজ। এদেরও দুজনের একাধিক হাতে অস্ত্র। পুরুষটির এক হাতে তিনমাথা একটি মুণ্ড।মূর্তির গলায় নরকরোটি ও নরমুণ্ডের মালা।নারী মূর্তির পায়ের তলায় দুটি শায়িত মূর্তি, সম্ভবত পুরুষের।তাদের একজনের পরনে বাঘছাল। মূর্তির নাম চক্রসম্বর। এও সেই উচ্চমার্গের তন্ত্র। এর কাজ আবেগ মারফত আত্মাভিমানকে পরিবহন। এর বাঁদিকে আলিঙ্গনরত দুটি ভয়াবহ মূর্তি। পুরুষ মূর্তির রঙ নীল। পশুর মাথার মতো মোট নয়টি মাথা দেখা যাচ্ছে। সামনে একটি নীল রঙের বড় মাথার দুপাশে তিনটি করে অন্য রঙের মাথা। সেই নীল মাথার ওপরে আবার লাল মাথা, তার ওপরে হলুদ মাথা। আলিঙ্গনরত নারী মূর্তিটি ছাইরঙের। পুরুষ মূর্তির অজস্র হাত-পা। হাতে নানা অস্ত্র, পায়ের তলায় মানুষ ও হাতি। গলায় ও মাথায় নরকঙ্কাল। গলায় নরমুণ্ডের মালা। এই মূর্তিটির নাম বজ্রভৈরব। মঞ্জুশ্রীর সবচেয়ে রাগতভাব। তার রাগ এতটাই বেশি যে সে রাগ নিজেকেও কখনও আত্মীভূত করে ফেলে। একেবারে আমার রাগের মতো আর কী। এ হল এক ধরণের শূন্যতা যা প্রকাশ পায় প্রবল রাগের ভেতর দিয়ে।
প্রার্থনা শেষ হল। ওরই মাঝে ছোট-বড় লামারা কাঠের বাটি-চামচে স্যুপজাতীয় কিছু খেল। আমরাও বাইরে বেরিয়ে আসি। সামনে তাকালে খেত, ছাড়া ছাড়া বাড়িঘর। ওরই মাঝে সিন্ধু বয়ে যাচ্ছে আপনমনে। দূরে একপাশে ন্যাড়া পাহাড় আর অন্যদিকে পাহাড়ের মাথায় বরফ সূর্যের আলোয় ঝলসাচ্ছে।

দুপুর ২ টো। শ্যে প্যালেস।

শ্যে প্যালেসের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়াল। অনেক সিঁড়ি। আজ আবার এত সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠব না। প্যালেসের সামনে রাস্তার ওপারে ঘেরা জায়গায় জলে মাছ খেলা করে বেড়াচ্ছে। আকাশ আর গাছের প্রতিফলন জলে। পেছনে ঝলমলে উপত্যকার বিস্তার। রাস্তার ধারে অসংখ্য প্রেয়ার ফ্ল্যাগ। ফাঁকে ফাঁকে বিজেপি-র পতাকাও চোখে পড়ছে। মনে প্রশ্ন জাগল, বৌদ্ধদের কোনও রাজনৈতিক দল নেই কেন?

রাস্তার ধারে ন্যাড়া পাহাড়ের গায়ে হলুদ পাতার ঝাঁকড়া মাথার গাছগুলো মাথা দুলিয়ে কী যে বলছিল জানিনা, তবে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল ওদের।
কংগ্রেসের পতাকা লাগানো একটা গাড়ি গেল পাশ দিয়ে। এরমধ্যেই কবে যেন ভোট। 'জিতেগা, জিতেগা, কংগ্রেস পার্টি জিতেগা।' এই সপ্তাহেই লাদাখে পঞ্চায়েত ভোট হবে। অনাবিল এই শান্ত সৌন্দর্যের মাঝে সেদিকে তাকিয়ে মুখ দিয়ে অস্ফুটে একটা কথাই বেরিয়ে এল - 'ভারতবর্ষ'!
আকাশ পরিস্কার। রাস্তাতে সবসময়েই বরফমাথা পাহাড় দেখা যাচ্ছে। এইমাত্র আকাশে দু-তিন টুকরো আলগা মেঘ ভেসে এল।
আসলে এখানকার ভাষা নিস্তব্ধতা। দীর্ঘক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে ইচ্ছে করে কোথাও।

দুপুর ৩টে। হল অফ ফেম

লে এয়ারফিল্ডের কাছেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর তৈরি দোতলা 'হল অফ ফেম' মিউজিয়াম। ইন্দো-পাক যুদ্ধে বিশেষতঃ কার্গিল যুদ্ধে নিহত সেনাদের স্মৃতিতে এটি নির্মিত। একতলায় নিহত সেনাদের ও বিভিন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে তথ্যাবলী এবং একটি স্যুভেনির শপ রয়েছে। দোতলায় সৈনিকদের ব্যবহৃত নানা জিনিসপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধ সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ইত্যাদি রয়েছে। সিয়াচেন গ্লেসিয়ারে প্রতিরক্ষার আয়োজন সংক্রান্ত একটি আলাদা সেকশনও আছে।
বেশ খিদে পেয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি দেখা শেষ করে পাশেই একটা দোকানে ঢুকে দুপুরের খাওয়া হল।

বেলা ৩-৪৫। স্পিতুক মনাস্ট্রি

লেহ্ শহরের আশেপাশে

একশো চল্লিশটা সিঁড়ি ভেঙে এতটা ওপরে না এলে পাহাড়ের ব্যাকগ্রাউন্ডে সিন্ধু উপত্যকার এই ব্যাপ্তি ঠিক অনুভব করা যেত না। গুম্ফার মতো মনাস্ট্রিটিতে বুদ্ধমূর্তির মুখ ঢাকা। বছরে একবার উৎসবের সময় ঢাকা খোলা হয়। ভেতরে মহাকাল মূর্তি। মেয়ে আর দীপ দেখে এসে বলে। জুতো খুলে ভেতরে ঢুকতে ইচ্ছে করেনা আর। মানে এই ভারি জুতোজোড়ার সঙ্গে জুতোজুতি বা গুঁতোগুঁতি করতে। স্পিতুকের অবশ্য তেমন কিছু গল্প নেই। ১১ শতকে লামা চামচুগ ওড এব-এর ভাই ওড-ডে মনাস্ট্রিটির প্রতিষ্ঠা করলে লোৎসেওয়া রিনচেন জাংপো বলেছিলেন, এই স্থান থেকে এমন একটি ধর্মীয় জাতির উদ্ভব হবে যা একটা উদাহরণ রেখে যাবে। ১৪ শতকে রাজা গ্রাস-পা-বুল-ল্ডে মনাস্ট্রিটির নতুন করে সংরক্ষণ করেন। লাল টুপিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলেও পরে হলুদ টুপির দল মনাস্ট্রির অধিকার দখল করে।

স্পিতুক মনাস্ট্রির সামনের উপত্যকা

তুমি তো জানোই ধর্মের এসব কচকচি আমার ভালো লাগে না। তথ্য জানার জন্য পড়তে হয়, লিখতেও হয়। ওপরের চত্বরে ক্লান্ত আমি ঘুরে বেড়াই। উপত্যকার বিস্তীর্ণ দৃশ্য চোখ টানে - একপাশে রুক্ষতা, অন্যদিকে সবুজ।

নামার সময় সিঁড়ির পাশে উজ্জ্বল হলুদ পাতায় আলো আলো গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলাতে বেশ লাগে। মনটাও আলো হয়ে যায় যেন। আকাশে এতক্ষণে অনেকটা সাদা মেঘ উঠেছে।

বিকেল ৪-৩০। শান্তি স্তূপ

পাহাড়চূড়ায় উঠে বিশাল স্তূপটাকে দেখে চন্দনদার সহাস্য মন্তব্য - সমুখে শান্তি স্তূপাকার, রবীন্দ্রনাথ এই দেখেই লিখেছিলেন।

ওপর থেকে লে শহরের প্যানোরামিক দৃশ্য দেখে দেখে মুগ্ধ হই বারবার। বিকেল ফুরিয়ে আসছে, শীত করে। ঠান্ডার গায়ে বিষণ্ণতার একটা আঁচল জড়ানো থাকে। পাহাড়ি রুক্ষতায় হলুদ ম্যাপেল পাতা ঝরায় সে বিষণ্ণতা বাড়ে।

শান্তি স্তূপ

ভাবছি, ক্যামেরার ফ্রেমে বেশি বড় ছবি ধরা পড়ে নাকি মনে?

রোদ পড়ে আসছে, ঠান্ডা বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। একেকটা জায়গায় ন্যাড়া পাহাড় পাথুরে, একেক জায়গায় বালির মতো লাগছে।

একা একা নামছিলাম। এক বয়স্ক লামা হাসি মুখে অন্য কোনও ভাষায় প্রশ্ন করলেন। বুঝতে পারলাম না, ইংরেজিতে জানতে চাই কি বলছেন? উনি এবার ইংরেজিতেই জিজ্ঞাসা করেন, কোন দেশ থেকে এসেছি? বুঝলাম বিদেশি ভাবছেন। হাসি মুখে বলি, কলকাতা। উনিও কলকাতা শুনে হেসে বলেন, 'বালোবাসি।' মজা লাগে শুনে। ওঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে নামি। প্রশ্ন করেন, 'এত মানুষ কলকাতা থেকে এখানে আসেন কেন? আমরা যদি যাই?' বলি, আসুন না, কিন্তু আপনাদের এখানকার মতো এত সুন্দর নয় আমাদের শহর। আমরা ভিড়ের মধ্যে থেকে ক্লান্ত হয়ে এখানে বেড়াতে এসে নিঃশ্বাস নিই। আপনাদের হয়তো কষ্ট হবে, তবু আসুন।

৫-৩০। শঙ্কর গুম্ফা
দিনের শেষে পৌঁছাই শঙ্কর মনাস্ট্রিতে। ঘরের ভেতর ঘর। একেবারে বাইরের ঘরে ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মৈত্রেয়-র তান্ত্রিক মূর্তির সামনে একা একজন লামা মন্ত্রপাঠ করছেন। মাঝে মাঝে একটা বড় চ্যাপ্টা ঢাকের মতো বাদ্যযন্ত্রে বড় লাঠির মতো ডান্ডা দিয়ে আঘাত করছেন। ভারী গম্ভীর একটা আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছে। ভেতরে ঢুকি। ভেতরের চারটে ঘর জুড়ে বিভিন্ন বৌদ্ধ গুরুদের মূর্তি। যার মধ্যে অনেক মাথার অবলোকিতেশ্বর মূর্তি বারবার নজর কাড়ে। একেবারে ভেতরের ঘরে নারীরূপে একটি অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি চোখে পড়ল যেটা আর কোথাও দেখিনি। মাঝের একটা ঘরে বেশ কয়েকজন লামা বসেছিলেন। তাঁরা প্রসাদ দিলেন হাতে।
হোটেলে ফিরছি যখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে।

(ক্রমশ)

থিকসে মনাস্ট্রিতে গুরু রিনপোচে (পদ্মসম্ভব)-এর মূর্তি

~ লাদাখের আরও ছবি ~

'আমাদের ছুটি' আন্তর্জাল ভ্রমণ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক দময়ন্তী দাশগুপ্ত নেশায় লেখক, ভ্রামণিক, ভ্রমণসাহিত্য গবেষক। প্রকাশিত বই - 'অবলা বসুর 'ভ্রমণকথা', 'আমাদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত - ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গমহিলাদের ভ্রমণকথা' (সঙ্কলিত এবং সম্পাদিত)

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

এবার মেদিনীপুর

তপন পাল

-১-

এবারের গন্তব্য পাথরা - মেদিনীপুর শহর থেকে দশ কিলোমিটার দূরে, কংসাবতী নদীতীরের এই গ্রামটি দুশো বছরেরও বেশি পুরাতন; চৌত্রিশটি মন্দিরের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ।

১৭২৮ সালে মহম্মদ আলি রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত হলেন। নাম নিলেন আলিবর্দি খান। ১৭৩২ সালে বৈদ্যনাথ ঘোষালকে তিনি রত্নচক পরগনার রাজস্ব আদায়কারীর পদে নিযুক্ত করলেন। তারপর ১৭৩৩-এ আলিবর্দি বিহারের নায়েব নাজিম। ১৭৪০-এ গিরিয়ার যুদ্ধজয়, ১৭৪১-এ ফুলওয়ারির যুদ্ধজয় করে তিনি বাংলা বিহার উড়িষ্যার একচ্ছত্র নবাব। তাঁর শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যনাথবাবুরও উত্থান, মজুমদার পদবি গ্রহণ, ক্রমান্বয়ে মন্দির নির্মাণ ও অগণিত পুণ্যার্থী সমাগম।

নবাব বাহাদুর ঘোষালের এই খ্যাতিবিস্তৃতি ভালো চোখে দেখলেন না। বন্দীত্ব ও হস্তীপদে মস্তক চূর্ণ করার আদেশ জারি হল। কিন্তু হাতিটি ছিল ভারি লক্ষ্মী। সে দাঁড়িয়ে রইল স্থাণুবৎ। ঘোষালের মুক্তি আর আটকায় কে! প্রথানুগ রাজকর্ম থেকে পরিবারটি সরে এল বাণিজ্যে। নীলচাষ তখন সদ্য শুরু হয়েছে। ওই পরিবারেরই আর একটি শাখা বন্দোপাধ্যায় পদবি নিয়ে তখন বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। পরপর গড়ে উঠতে লাগল মন্দির।

পরবর্তীকালে পরিবারটির বাসস্থান পরিবর্তন ও আনুষঙ্গিক কারণে মন্দিররাজি যখন সরকার বাহাদুর ও বিদ্বজ্জনের ঔদাসীন্যে বিলুপ্তির পথে, তখন, ষাটের দশকের মাঝামাঝি, ইয়াসিন পাঠান নামধারী জনৈক স্থানীয় বাসিন্দার আগ্রহে খড়্গপুর আই আই টির তত্বাবধানে সরকার বাহাদুর মন্দিররাজির সংরক্ষণে সম্মত হন।

কিন্তু এ তো গেল প্রায় আড়াই শতকব্যাপী ইতিহাস। এবার বর্তমান।

-২-

সকালবেলায় হাওড়া। সাড়ে ছটার মেদিনীপুর লোকাল। পথের সব স্টেশনে থেমে, দ্রুতগামী রেলগাড়িগুলিকে পথ দিতে দিতে উলুবেড়িয়া, মেচেদা, পাঁশকুড়া, খড়্গপুর পেরিয়ে মেদিনীপুর। যাত্রাটি দীর্ঘ, অনধিক সাড়ে তিন ঘণ্টার; তবে কোনভাবেই ক্লান্তিকর নয়। বর্ষা প্রায় এসে গেছে, তবু আকাশে অকাল শরৎ। লাইনের দুধারে টগর, পুটুশ, আকন্দরা বিছিয়ে আছে, চলনবিলে পদ্মপাতা হাত তুলে ডাকছে। ভূচিত্র সবুজ, সন্ধিপূজার পদ্মরা পুকুরে সম্ভাবিত হয়ে উঠছে অলক্ষ্যে। দামোদর, রূপনারায়ণ, কংসাবতী পেরিয়ে মেদিনীপুর - এবং রেলগাড়িতে সারাপথ ভক্ষ্যের অবিরত বৈচিত্র্যময় সমাহার ও সদ্ব্যবহার।

স্টেশনে থেকে বেরিয়েই রিক্সা অটো ভাড়াগাড়ির সম্মিলিত হ্রেষাধ্বনি। এক ভাড়াগাড়িচালককে আমি যতই বলি যে আমি পাথরা দেখব, তারপর সময় থাকলে কর্ণগড়, মালঞ্চ, হিজলি... সে ততই বলে ভাববেন না, আপনাকে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, ডি এম অফিস, গির্জা... সব দেখিয়ে দেবো। শেষে তাঁকে কিঞ্চিৎ কড়াভাবেই বলতে হলো দেখো বাবা, আমি থাকতে আসিনি। নতুন জিনিস কিছু দেখব না; তুমি আমাকে পুরনো জিনিসই দেখাও। ভ্রাতাটি আমার ভোজনরসিক। এতদূরে এলে, আর হিজলির ক্ষিরের গজা না খেয়েই চলে যাবে? চলো না! আরে একটু আধটু সুগার সব বাঙালিরই আছে। তাতে কি কারও মিষ্টি খাওয়া আটকাচ্ছে? বাস ডিপো, হাসপাতাল, অগণন রিক্সা অটোর সারি, ক্রিং ক্রিং প্যাঁ প্যাঁ পেরিয়ে শহর শেষ। তারপর ফাঁকা মাঠ, ঢেউখেলানো জমি। তবে শহর ক্রমবিস্তৃতির পথে খুব শিগগির এখানেও এসে পৌঁছবে। কংসাবতীর গা দিয়ে হাতিহালকা পাথরা রোড।

কিন্তু হাতি কখনও হালকা হয় নাকি? আমি হাতি তুলে কখনও দেখিনি বটে, তবে যাঁরা তুলেছেন তাঁরা বলেন হাতি বেশ ভারি। আমাদের শৈশবে পুজোর সময় মাঠে সার্কাসের তাঁবু পড়ত। সেখানে এক পালোয়ান বুকে হাতি তুলতেন। হাতি তাঁর বুকের ওপর দিয়ে চলে যাওয়ার পরেও অনেকক্ষণ তিনি শুয়ে থাকতেন। তারপর উঠতেন। তাঁর হাবভাব আচরণ দেখে বাল্যকালেই আমার ধারণা হয়েছিলো যে হাতি অতিশয় ভারি; এতটাই ভারি যে হাতিকে চাঁদে বা মঙ্গলগ্রহে নিয়ে গেলেও সে ভারিই থাকবে। ক্রমে জানা গেলো হাতিহালকা এক ঈদগা মসজিদের নাম। তার নামে সংখ্যালঘু প্রধান গ্রামটির নামও হাতিহালকা। এক সন্ত পির নাকি একদা এক উদ্ধত দুর্বিনীত হাতিকে হালকা করে আকাশে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে এই নাম। এই অঞ্চলে হাতির উৎপাত নিয়মিত, ফলে গল্পটি অবিশ্বাস করিনি। রাস্তায় দুহাত পরপর চাঁদার উৎপাত। কারণ সামনে ঈদ। রামনগর আই সি ডি এস সেন্টারের সামনে যে দলটি ঈদের চাঁদার জন্যে গাড়ি দাঁড় করালো তাদের তিনজনের কব্জিতে লাল সুতো তাগার মত বাঁধা। বিনা পরিশ্রমে ফুর্তি করার সুযোগ আমোদগেঁড়ে কর্মবিমুখ বাঙালি কবে ছেড়েছে?

পশ্চিমবঙ্গে পর্যটন শিল্পের উন্নতির পন্থা প্রকরণ নিয়ে যারা ভাবেন, তাঁরা কি এই সমস্যার বিষয়ে আদৌ অবগত? আমি মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াই, তাই জানি যে এই ব্যাধি সারা পশ্চিমবঙ্গে বছরভর। দুর্গা কালী জগদ্ধাত্রী সরস্বতী পুজোর সময় নির্দিষ্ট। অপরাপর সময়ে রক্ষাকালী, গণেশ, শীতলা, পঞ্চানন্দ, শিব... খলের হয় না ছলের অভাব! একটা লাগিয়ে দিলেই হল। দুর্গাপুর কিংবা মেদিনীপুর, রামপুরহাট কিংবা কোলাঘাট, গাড়িভাড়া করতে গিয়ে বাতানুকূলিত তো দূরস্থান, অবাতানুকূলিত ভদ্রস্থ গাড়িও পাওয়া যায় না। ঘুরে ফিরে সেই লজঝড়ে মারুতি ওমনি। প্রতিতুলনায় ওড়িশা বা উত্তর প্রদেশের কোন শহরে পৌঁছে পছন্দমত গাড়ি ভাড়া করতে অসুবিধা হয় না। যে বা যিনি বেড়াতে যাবেন, তিনি পয়সা খরচ করবেন। সেই পয়সা স্থানীয় অর্থনীতিতে অক্সিজেন যোগাবে। যিনি পয়সা খরচা করছেন, তিনি তার বিনিময়ে কিছু স্বাচ্ছন্দ্য প্রত্যাশা করতেই পারেন। কিন্তু আমরা তা দিতে অপারগ।

রাস্তা বরাবর দুহাত পরপর লটারির দোকান। গ্রামীণ মানুষ কি সত্যিসত্যি বিশ্বাস করে যে লটারির টিকিট কেটে বড়লোক হওয়া যেতে পারে! এরই মধ্যে লিকপিকে সেতু পেরিয়ে পাথরা।

-৩-

পাথরায় পথিপার্শ্বে, কাঁসাইয়ের কূলে, গ্রামের ভিতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে অদ্যাবধি চৌত্রিশটি মন্দির, তার মধ্যে আঠাশটি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ এর আওতায়। কিছু ভেসে গ্যাছে কাঁসাইয়ের জলে, আজি পুবের হাওয়ায় হাওয়ায় তার চিহ্ন অবলুপ্ত। শক্ত ল্যাটেরাইট পাথরের নবরত্ন মন্দিরটি পথিপার্শ্বে, পাশে এক আটচালা মন্দির, শিবালয়, ভগ্নপ্রায় দুর্গাদালান। গ্রামে ঢোকার মুখে কতিপয়, সেগুলি দেখে আমরা গ্রামের দিকে। আকাশে অকাল শরৎ, কাঁসাইয়ের জলে তারই ছায়া। ছাগল চরিয়ে, জ্বালানি ডালপালা সংগ্রহ করে মেয়েরা উঠে আসছে নদীগর্ভ থেকে। জীবন এখানে ধীর লয়ে চলে।

অতঃপর গ্রামে। মজুমদারদের কাছারিবাড়ি ধ্বংসের মুখে; আগাছাসঙ্কুল, মনুষ্যবর্জ্যে ভরপুর। পা বাঁচিয়ে ঢুকতে গিয়ে কতিপয় গ্রামবাসীর কৌতূহলের মুখে পড়তে হল। তাঁরা জানালেন সকালের দিকে হলে ঢুকতে পারতেন না। চন্দ্রবোড়ারা (Russell's Viper: Daboia russelii) সারারাত এখানে থাকে, রোদ বাড়লে বনের মধ্যে ঢুকে যায়। এরকম সম্ভাবনা আগেই মাথায় এসেছিল, তদনুযায়ী প্রস্তুতিও ছিল। গ্রামের ছেলে হওয়ার সুবাদে সাপদের সঙ্গে চিরকালই আমার ভাব ভালবাসা! এতদূর এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা না করে চলে যাওয়া যায় নাকি; বিশেষত চন্দ্রবোড়ার মত সেলেব্রিটি সাপের সঙ্গে! ভারতে এই সাপের কামড়েই সর্বাপেক্ষা বেশি লোক মারা যান, এবং অতীব যন্ত্রণাদায়ক সেই মৃত্যু। গোখরা, কেউটে, শাঁখামুটি, কালাচের মত চন্দ্রবোড়ার কামড়ে মৃত্যু তাৎক্ষণিক নয়, বিলম্বিত। তা পাওয়া গেলো একটা। ভারী বুটের ভুমিস্পন্দনে বেচারা পালাবার পথ খুঁজছিলো। সব প্রজাতির সাপই বন্যপ্রাণ (সংরক্ষণ) আইন ১৯৭২ দ্বারা সংরক্ষিত ও সাপ মারা একটি জামিন-অযোগ্য অপরাধ। কৈশোর পেরোবার পর আমি সাপ মেরেছি বলে মনে পড়ে না। কাছারিবাড়ির সিঁড়ি ভগ্নপ্রায়, মাথা তুলেছে অশ্বত্থ নিম বট। তাদের ধরেই ছাদে ওঠা গেল। চোখ অনেকদুর অবধি দেখতে পাচ্ছে; লাল, ঈষৎ ঢেউখেলানো ভূমি বিছিয়ে ইউক্যালিপটাস সোনাঝুরি নিম। দূরে গাঁদার বেগুনের বরবটির আবাদ, আর কাঁসাই। মজুমদারদের কাছারিবাড়ির সামনেই পাশাপাশি তিনটি পঞ্চরত্ন, ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছোটবড় আরও কয়েকটি। খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় প্রতিটিই অনন্য। কার কার দেওয়ালগাত্রে পোড়ামাটির কাজ। কাছেই রাসমঞ্চ। একটু এগিয়ে শীতলা মন্দির, লোকমুখে তার নাম বুড়িমার থান।

-৪-

এবার ফেরার পালা মেদিনীপুরে। মেদিনীপুর শহরটাও মোটামুটি ঐতিহাসিক। নতুনবাজারে কংসাবতীর ধারে পঞ্চরত্ন ধাঁচের কালী মন্দির, সঙ্গে তিনশো বছরের অশ্বত্থ। কিছুটা দূরেই দাঁড়িয়ে দেড়শ বছরের জগন্নাথ, তবে এখন অনসরকাল, শ্রীজগন্নাথ ভ্রাতা ভগিনী সহ শয্যাগত। রাজবৈদ্য পাঁচন সেবন করাচ্ছেন; মন্দির বন্ধ। ষোড়শ শতকের পির লোহানি বাবার মসজিদ দেখে মিরবাজারে টিকিয়া মসজিদ, আর আলিগঞ্জে সম্রাট আওরঙ্গজেবের দিওয়ান কেফায়েতুল্লা দ্বারা নির্মিত পুর্বমুখী তিন গম্বুজের দিওয়ানখানা মসজিদ। মির্জা মহল্লায় সপ্তদশ শতকের জোড়া মসজিদ, আর খানকা শরিফ, মহম্মদ মৌলানা হজরত শায়েদ শাহ মেহের আলি আলকাজুরির সমাধি। মহতাবপুরের এদ্গার শাহ সাহেবের সমাধিতে দুই সম্প্রদায়ের লোকেই শিরনি চড়ায়। বিস্তর ঘোরাঘুরি হল শহরে। এবারে তো মহাপ্রাণীটির কথা ভাবতে হয়। জেলা পরিষদ ভবনের সম্মুখে এক পাইস হোটেল। গরম ভাত ডাল পোস্তর বড়া আলুভাজা, উচ্ছে কুমড়ো বরবটির এক অনুপম চচ্চড়ি, সুসিদ্ধ সীতাপতি বিহঙ্গমের পাতলা ঝোল, আম তেঁতুলের চাটনি। বড় শান্তি হল খেয়ে। গরিবের ছেলে তো, ভালোমন্দ একটু খেতে পেলে বড় খুশি হই গো!

-৫-

পরবর্তী গন্তব্য কর্ণগড়, লোকবিশ্বাসে মহাভারতের কর্ণের রাজ্য। শালবনির পথে ভাদুতলা। সেখান থেকে ডাইনে বেঁকে সংরক্ষিত অরণ্যের গা বেয়ে রাস্তা অনাবাদি উষর জমি চিরে। ১৭৯৮-এ রানী শিরোমণির নেতৃত্বে চুয়াড় বিদ্রোহের উৎসস্থল। বৃটিশরাজ কি নির্মমভাবে এই বিদ্রোহ দমন করেছিল তা তো আমরা জানি।

আমাদের দ্রষ্টব্য উড়িষ্যার কেশরী রাজবংশের রাজা মহাবীর সিং নির্মিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ।ওই রাজবংশের রাজা কর্ণকেশরী কর্তৃক নির্মিত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্থানীয় মন্দিরগুলি। কিন্তু চালক আমাদের নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলো মহামায়া মন্দিরে। আরে ভাই গড় কই? ঈষৎ রুখো উচ্চারণে, তেরিয়া মেজাজে সে জানাল গড় কই তা সে কি করে জানবে? 'তুমি বলেছিলে কর্ণগড়, তো এটাই কর্ণগড়। বিশ্বাস না হয় দেখে নাও, লেখা আছে'। সে তো আছেই। কিন্তু আস্ত একটা দুর্গ লোপাট হয়ে যাবে এটাও তো মেনে নেওয়া যায় না। মহামায়া মন্দিরের প্রশাসনিক লোকজনদের জিজ্ঞাসা করতে তাঁরা অবাক হলেন। এই লতপতানি গরমে এক প্রায় প্রৌঢ় দুপুর রোদে কিনা গড় দেখতে যেতে চায়! তাঁরা বিস্তর চেষ্টা করলেন আমাকে নিরুৎসাহিত করার - কিচ্ছু নেই মশাই, গিয়ে কি দেখবেন। শেষমেশ আমি শুধু ওই গড়টি দেখার জন্যেই কলকাতা থেকে গেছি শুনে জানালেন ওখান থেকে তিন কিলোমিটার গিয়ে, গাড়ি রেখে, কাঁদর (একধরণের ছোট নদীর মত। দুটো ঢাল দুদিক থেকে এসে মিশলে মাঝখানে একটা খাদের সৃষ্টি হয়। বর্ষায় সেখানে জল জমে, নামে বড় নদীর পানে) ধরে কিলোমিটার খানেক হাঁটলে পড়বে নদী। নদীতে এখন জল নেই, হেঁটে পেরনো যাবে। ওপারে সেই দুর্গ। পথ দেখানোর জন্য একজনকে দিলেন।

তা যাওয়া গেল। ভরদুপুরে চারদিকে মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা। কেউ কোথাও নেই। কাঁদর ধরে হেঁটে নদীও পাওয়া গেলো। পূর্বরাত্রে বৃষ্টি হয়েছে। নদীর বুকের শরঘাস হোগলাবন পেরিয়ে কিছুটা যাওয়ার পর ভালোই জল, হেঁটে যাওয়া যাবেনা। কোথাও কেউ নেই, ব্যাগে গামছা আছে, তবু সাহস হলো না কারণ ওপারের পাড় খাড়া উঠে গেছে অরণ্যানীতে। দূরবীনে দেখা গেলো ভাঙা ইট ছড়ানো। যতই চেঁচাই, কেউ শুনতে পাবেনা। ভাম বনবিড়াল খ্যাঁকশিয়াল খাটাশ ধরলে, যদি তারপরে বেঁচেও থাকি, ইনজেকশন নিতে হবে। এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে। ওপারের দুর্গ ভৌতিক স্বরে ডেকে বলল, কোথা যাও, পান্থ, কোথা যাও - আমি নহি পরিচিত, মোর পানে ফিরিয়া তাকাও। ততক্ষণে আমি গাড়িতে। গাইডটিকে সম্মানদক্ষিণা দিয়ে মহামায়া মন্দিরে নামিয়ে সিধে মেদিনীপুর ইস্টিশনে। পথে একপশলা বৃষ্টি। তখন তিনটে তেত্রিশ, কিন্তু তিনটে তিরিশের লোকাল ছাড়েনি। একদৌড়ে জানালার পাশে।

-৬-

তা বারো কামরার লোকাল ছাড়লো, কংসাবতীও পেরোল। ও মা! তারপর দেখি একটা স্টেশন, নাম কাঁসাই হল্ট। অবসরে রেলচর্চা করে থাকি, কিন্তু এমন মজার ইস্টিশন আগে দেখিনি। হ্রস্ব প্ল্যাটফর্ম, শুধুমাত্র চতুর্থ কামরাটি প্ল্যাটফর্মে, সামনে পিছনে বাকি এগারোটি বাইরে।

খড়গপুর, এবং বহু প্রতীক্ষিত লেবু চা। অম্বুবাচীনিবৃত্তি পরবর্তী দিনটি দ্রৌপদীর শাড়ির মত দীর্ঘ। নিসর্গ দেখতে দেখতে, আকাশে শামুকখোলের দলের নীড়ে ফেরা দেখতে দেখতে বাউড়িয়া পৌঁছালাম ছটায়। তখনও আকাশে রোদ।

গ্রন্থঋণঃ

১। Blair B. Kling: The Blue Mutiny, The Indigo Disturbances in Bengal, 1859-1862 (Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1966)

২। Dictionary of Historical Places. Bengal. 1757 -1947, Department of History, Jadabpore University, PRIMUS BOOKS

৩। The Telegraph, Next weekend you can be at ... March 2, 2008, July 6, 2008

৪। Lewis Sydney Stewart O'Malley, Bengal District Gazetteers - Midnapore, Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta, 1911

৫। কিংবদন্তীর দেশে, সুবোধ ঘোষ। কলিকাতা নিউ এজ পাবলিশার্স। ১৯৬১

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অডিট ও অ্যাকাউন্টস বিভাগের কর্মী তপন পাল বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ফ্যান ক্লাবের সদস্য। ভালোবাসেন বেড়াতে আর ছবি তুলতে। 'আমাদের ছুটি'-র জন্যই তাঁর কলম ধরা।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

Tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ত্রিবেণী তীর্থপথে

উদয়ন লাহিড়ি

ওপরে সবুজ আর নীচে হলুদ। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একজন খৈনি পিষছে। আরেকজন দেখলাম জানালা দিয়ে যতটা সম্ভব মুখ বার করে বলল "ওয়াক থু"। এরই নাম লোকাল ট্রেন। তাতেই সবাই উঠে পড়লাম। যাব কল্যাণী হয়ে ত্রিবেণী। হাওড়া থেকেও বর্ধমান কাটোয়া লাইনের ট্রেন ধরেও যাওয়া যায় ব্যান্ডেল। ওখান থেকে ত্রিবেণী। আমরা যাচ্ছি শিয়ালদহ হয়ে। মাত্র ৪৮ কিমি দূরে কল্যাণী। কল্যাণী থেকে ম্যাজিক গাড়ি ধরে ত্রিবেণী - উদ্দেশ্য এই অঞ্চলের তিন ধর্মের প্রধান স্থাপত্যগুলো দেখা।এখানে খ্রিস্টান, মুসলিম এবং হিন্দু ধর্মের যেভাবে মেলবন্ধন হয়েছে তার নিদর্শন অন্য কোথাও আছে কিনা সন্দেহ আছে। প্রকৃত অর্থেই ত্রিবেণী। জাফর খান গাজীর দরগা, হংসেশ্বরী মন্দির, অনন্ত বাসুদেব মন্দির, বিখ্যাত ব্যান্ডেল চার্চ, ইমামবাড়া। তিনটি ধর্মের বিখ্যাত এতগুলো স্থাপত্য একেবারে এক দিনে দেখে ফেলা - আজ ২৬ জুন,২০১৬।

আমার মনে হয়, এই সব জায়গা সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করতে তিনটে ব্যাপার জানা দরকার - পৌরাণিক, স্থানীয় ইতিহাস আর কিছু লোকশ্রুতি। যে কটা জায়গায় গেলাম তার সম্পর্কে এই সব ঘটনা ঘাঁটবার কিছুটা চেষ্টা করেছি। কিছুটা আন্তর্জাল, বাকি বই আর খানিক স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে কথা বলে সংগৃহিত। তথ্যের ভুল বা কোথাও আমার বোঝার ভুল হলে মার্জনা করবেন। আর শুধরে দিলে আমার স্বল্প জ্ঞানে কিছু আলোর ছিটে লাগবে।

ট্রেন চলেছে। গাছপালা সব পেছনে সরে যাচ্ছে। পৃথিবীকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবার আনন্দে বাইরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি। দলের বাকিরা নিজেদের মধ্যে আড্ডায় মশগুল।আমার সে দিকে নজর নেই। মনে হচ্ছে, ট্রেনটা যেন একটা টাইম মেশিন - নিয়ে চলেছে শত শত বছর আগের এক যুগে। যেখানে আমি একজন অত্যন্ত আধুনিক মানুষ - বিজ্ঞান চিন্তা, পোশাক-আষাক, মোবাইল সবকিছু নিয়ে। এই গর্ব যে বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না, একটু গভীর চিন্তা করেই বুঝলাম। আজ যে সব স্থাপত্য দেখব, সেই রকমটি কই আজকের স্থপতিরা তো তৈরি করতে পারেন না। কই সেই অপূর্ব কারুকার্য,যা আজকের শিল্পীরা বানাতে পারেন না।এই স্থাপত্যগুলির যে গল্প কই আজকের সাহিত্যিকরা তো লিখতে পারেন না। আধুনিকতায় কে জিতবে আর কে হারবে সেই দোলাচল নিয়ে দেখতে চললাম সেই সব স্থাপত্য যা আমি পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পরও একই রকম থেকে যাবে। আমার পরের প্রজন্ম আবারও হয়তো লিখবে পুরানো সেই দিনের কথা, বারবার।

ট্রেনটা ভীষণ ব্রেক কষে জাড্য ধর্ম অনুযায়ী স্থিতিশীল বস্তুতে রূপান্তরিত হল আর আমিও দুম করে বাস্তবে এসে পড়লাম। কল্যাণী স্টেশন - হিসেবমত বর্ষা কাল। কিন্তু প্রখর রোদ্দুর পুড়িয়ে দিচ্ছে, এদিকে নীল আকাশে মেঘের ভেলা। তারমধ্যে ঘামে জামাকাপড় ভিজে যাচ্ছে। কল্যাণী স্টেশন থেকে যাচ্ছি ত্রিবেণী। একটা ম্যাজিক গাড়ি পেলাম।

হিন্দুপুরাণ অনুযায়ী বিশ্বকর্মা নাকি ঠিক করেন এখানেই তিনি দ্বিতীয় কাশী বা বেনারস বানাবেন। কিন্তু শিব কিছুতেই তা করতে দেননি। না হলে এটাই হয়তো আর একটা বেনারস হত। প্রচুর ঐতিহাসিক নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে। এত মন্দির এখানে ছিল যে ত্রিবেণীর নাম দেওয়া হয় তীর্থরাজ।

ত্রিবেণীতে দেখার মত হল বেণীমাধব মন্দির। মকরসংক্রান্তিতে খুব ভিড় হয়। কথিত আছে এখানেই কোনও এক কালে নাকি গঙ্গা যমুনা আর সরস্বতী মিলে গিয়েছিল। তাই থেকেই নাম হয় ত্রিবেণী। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা অনেক চেষ্টা করেও যমুনার কোনও অস্তিত্ব খুঁজে পাননি। তার বদলে রয়েছে বিদ্যাধরী নদী। সরস্বতী নাকি এখনও আছে যদিও সেটা খাল ছাড়া কিছু নয়, পানাতে ভরে গেছে। দেবানন্দপুরে গেলে দেখা যাবে মজে যাওয়া সরস্বতী নদী। পুরাণ আর ইতিহাসের মধ্যে বেশ ঝগড়া আছে মনে হচ্ছে।

কিন্তু শুধুই কি মন্দির! আছে মসজিদও। অসাধারণ স্থাপত্য তার। জাফর খান গাজীর মসজিদ। কল্যাণী স্টেশন থেকে প্রথমেই পড়বে ঈশ্বর গুপ্ত ব্রিজ। এখানে নদীর সৌন্দর্য তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবার মতো। ভীষণ জ্যামে আটকে ছিলাম বলেই দেখতে পেলাম ব্রিজের ওপর থেকে গঙ্গা। দেখলাম বালি মাফিয়ারা কিভাবে নদীর বালি তুলে নিচ্ছে। নদীর বালি তুলে নিয়ে কী সর্বনাশ যে এরা ডেকে আনছে সেটা একজন বিজ্ঞানীই সঠিক ভাবে বলতে পারেন। ঈশ্বর গুপ্ত ব্রিজ পেরিয়ে ত্রিবেণীর অন্যতম আকর্ষণ এই মসজিদ।

মসজিদটা আয়তক্ষেত্রাকার। ইট আর পাথরের তৈরি। এই জায়গাটা ছিল আদি সপ্তগ্রামের অংশ। সাল ১২৯৮। জাফর খান গাজী সপ্তগ্রাম আক্রমণ করলেন। রক্তে লাল হয়ে উঠল মাটি।তৎকালীন হিন্দুরাজ ধর্মপালকে হত্যা করলেন গাজী। বহু মন্দির ধ্বংস করলেন। সেই বছরই এই মসজিদটি তৈরি করেন জাফর খান গাজী। সমস্ত মন্দিরের ভাঙা অংশ দিয়ে তৈরি হল এই মসজিদ। গাজী ছিলেন দিল্লির সুলতানের সৈন্যদলের দলপতি। এই মসজিদের মূল মিরহাবের ওপর আরবি ভাষায় খোদাই করা একটি শিলালিপি থেকে জানা যায়। আসল ও পুরাতন মসজিদটির দশটি গম্বুজ ছিল। ছয়টি কোনোরকমে টিঁকে আছে। শিলালিপি থেকে এও জানা যায় এই মসজিদটি কোনও এক কালে মাদ্রাসা হিসেবেও ব্যবহার হত। কথিত একটি কৃষ্ণ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের ওপর তৈরি হয় এই মসজিদ। এখানে যিনি পীর আছেন তিনি নাকি আগে সূর্য প্রণাম না করে নামাজ পড়েন না। মসজিদের মূল প্রার্থনাস্থলের প্রবেশ পথটি পাঁচখিলানযুক্ত এবং পাথর আচ্ছাদিত। ছাদহীন ভিতরের প্রার্থনাকক্ষের সুদৃশ্য অলঙ্করণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রার্থনাকক্ষ দেখে বুঝলাম এটা শুধু মসজিদ নয়, দরগাও বটে। উঁচু রাস্তাটির পাশে সাবেকি বাতিদানগুলো পথের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। রাস্তাটি মসজিদের পাশ দিয়ে গোল করে ঘুরে গেছে। এ পথে হাঁটতে হাঁটতেই চোখে পড়ে হুগলী নদী।

ছাদহীন জাফর খাঁ গাজীর সমাধি সৌধটি ১৩১৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। শোনা যায় রাজস্থানের বাঘা মসজিদের স্থাপত্যের অনুকরণে করা। সম্ভবত পাথরগুলি আনাও হয়েছিল রাজস্থান থেকেই। সবই আগ্নেয় পাথর বা ব্যাসল্ট। বাকিটা হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসপ্রাপ্ত ইট, কাঠ আর পাথর। গোলাপি রঙের পাথরও দেখলাম।

ত্রিবেণী আর বাঁশবেড়িয়া পাশাপাশি। বাঁশবেড়িয়াও মন্দির-অধ্যুষিত গ্রাম। প্রচুর টেরাকোটার কাজ। একসময় নাকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং উৎসাহিত হয়ে নন্দলাল বসুকে দায়িত্ব দেন টেরাকোটার মন্দিরগুলির দেওয়ালে যে শিল্পকর্ম বা কারুকার্য আছে তা নথিভুক্ত করবার। নন্দলাল বসু এই নির্দেশ পালন করেছিলেন বলেই শোনা যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল, সেই নথি কোথায়? এর কোনও উত্তর পাইনি।

জাফর খান গাজীর মসজিদ

বাঁশবেড়িয়া ইতিহাসের পাতায় উঠে আসে শাহজাহানের সময়ে। তখন সালটা ছিল ১৬৫৬। শাহজাহান পাটুলির রাঘব দত্তরায়কে যে জমির জমিদার হিসাবে নিযুক্ত করেন সেটাই বর্তমানের বাঁশবেড়িয়া। কথিত আছে রাঘব দত্তরায়-এর ছেলে রামেশ্বর দত্তরায় একটা বিশাল দিগন্ত বিস্তৃত বাঁশবনকে পরিষ্কার করে তৈরি করেন একটা দুর্গ,দত্তরায়দের প্রাসাদ আর বাংলার দুটি মৌলিক স্থাপত্য সৃষ্টি - একটি হংসেশ্বরী মন্দির আর অন্যটি অনন্ত বাসুদেব মন্দির। সেই বাঁশবন থেকেই সম্ভবত এর নাম বাঁশবেড়িয়া। বাঁশবেড়িয়া আদি সপ্তগ্রামেরই আর একটি অংশ ছিল। সেই সময় এই গ্রাম ছিল একটি নাম করা বন্দর এবং ব্যবসা বাণিজ্যের পীঠস্থান।

অনন্ত বাসুদেব মন্দিরটি তৈরি করেন রামেশ্বর দত্তরায়। কৃষ্ণের মন্দির।১৬৭৯ সাল। এই মন্দিরের তিনটি দিকে আছে অসাধারণ টেরাকোটার কাজ। আর একটা দিক নিরাভরণ। অষ্টভুজ চিলেকোঠাটিতে টেরাকোটার কাজ অসাধারণ। বিভিন্ন দেবদেবী, নরনারীর প্রেম আর যুদ্ধের ছবি আঁকা আছে এইসব দেওয়ালে।

রাঢ় বাংলা যেমন মল্লভূমি। তেমনি বলা যেতেই পারে বাঁশবেড়িয়া হলো দত্তরায়ভূমি। বাংলার বাইরের স্থাপত্যে প্রচুর পাথরের ব্যবহার দেখা যায়। পাথরের তুলনায় মাটি সহজলভ্য হওয়ায় বাংলায় ব্যবহার হতো পোড়ামাটি। পাথরের মতো শক্ত, আর সুন্দর কারুকার্য করা যায়। টেরাকোটার প্রচলন হয় ইতালিতে। 'বেকড আর্থ' পরে নাম বদলে টেরাকোটা। কিন্তু এটা বলতে কোনও বাধা নেই যে বাংলার টেরাকোটার সমৃদ্ধ কাজের খ্যাতি জগতজোড়া।

হংসেশ্বরী মন্দির

প্রচলিত গল্পকথা বলে, একদিন গভীর রাতে নৃসিংহ দত্তরায় স্বপ্নাদেশ পান যে দেবী হংসেশ্বরীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ১৬৭৩ সালে মন্দিরটি তৈরি করা শুরু করলেও তাঁর অকালমৃত্যুতে মন্দিরটি শেষ করেন বিধবা রানি শঙ্করী। পাশেই অনন্তবাসুদেব মন্দির। মন্দির কমপ্লেক্সের বাইরে সোয়ানভাবা কালী মন্দির। মন্দির কমপ্লেক্স ঘিরে একটি পরিখা রয়েছে। এটাতে নাকি লঞ্চ চালু হয়েছিল। জেটিগুলো এখনো আছে। তবে লঞ্চ এখন আর চলে না। এটাও নৃসিংহ দত্তরায় তৈরি করেন। এই জায়গাটি ত্রিবেণী আর ব্যান্ডেলের মাঝামাঝি। জায়গাটিকে মন্দির কমপ্লেক্স বলা যেতেই পারে। হংসেশ্বরী মন্দিরের গড়ন সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। তেরোটি একুশ মিটার উঁচু মিনার আছে। এগুলো দেখতে অনেকটা প্রস্ফুটিত পদ্মের কুঁড়ির মতো। মিনারগুলোকে বলে এক একটি রত্ন। মন্দিরটির উচ্চতা একুশ মিটার আর ভেতরে পাঁচটি তলা। এই পাঁচটা তলা হল ইড়া, পিঙ্গলা, বজ্রাক্ষ, সুষুম্না এবং চিত্রিণী – মানুষের দেহের পাঁচ নাড়ীর সঙ্গে তুলনীয় কাপালিকমতে - হংসেশ্বরী স্বয়ং কুলকুণ্ডলিনী রূপে অবস্থিতা।

মন্দিরটাকে দেখলে হিন্দু স্থাপত্য বলে মনেই হয় না। যেন সেই শার্লক হোমসের রহস্য ঘন এক দুর্গের চেহারা। ইতিহাস ঘেঁটে বুঝলাম যে আদৌ হিন্দু স্থাপত্যই নয়। রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে 'অনিয়ন ডোম চার্চ' নামে বিখ্যাত বেসিলস ক্যাথিড্রাল-এর রেপ্লিকা এটি - একেবারে ট্রু কপি। মাথাটা পুরো গুলিয়ে গেল। তাহলে কি এটা আগে চার্চ ছিল যা দখল করা হয়েছিল? নাকি এর স্থপতি কোনও রাশিয়ান? মাথার মধ্যে প্রশ্নগুলো ঘুরতেই থাকল।

দেবী হংসেশ্বরী বসে আছেন পদ্মাসনে। চারটি হাত। নীল রং। নিমকাঠের তৈরি। হংসেশ্বরী দক্ষিণাকালীরই একটি রূপ বলে শুনলাম তবু যেন অজানা এক দেবী। কালী শুনেছি, দুর্গা, লক্ষী এসব শুনেছি। কিন্তু হংসেশ্বরী! এই মন্দির কমপ্লেক্সে বৈষ্ণব আর শাক্ত মতবাদ সহাবস্থান করছে।

এরপর ব্যান্ডেল চার্চ। আসল নাম কিন্তু ব্যান্ডেল চার্চ নয় - বাসিলিকা অফ হোলি রোজারি। পর্তুগিজদের তৈরি। সালটা ১৫৯৯। সেই বছরই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গোড়াপত্তন ঘটে আর রানি এলিজাবেথ ইংল্যান্ডে বসে অনুমোদন করেন ভারতে ওই নামে ইংরেজ উপনিবেশ গড়ে তোলবার।

একটা খুব ক্ষীণ মত আছে যে 'বন্দর' শব্দটির অপভ্রংশই ব্যান্ডেল। আর একটি জোরালো মতও আছে, সেটা পরে বলছি। মোগল সম্রাট আকবর পর্তুগিজদের অনুমতি দিলেন হুগলী নদী বন্দরটি ব্যবহার করবার জন্য যাতে পর্তুগিজরা এখানে নিজেদের বাসস্থান গড়ে তুলতে পারে। উপনিবেশ গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে পর্তুগিজ ক্যাথলিক পাদরিরা স্থানীয় আদিবাসীদের ধর্মান্তকরণ শুরু করেন। কিছুদিনের মধ্যে তৈরি হয় হাজার পাঁচেক খ্রিস্টান জনবসতি। ১৫৭৯ তে পর্তুগিজরা এখানে একটা পূর্ণ বন্দর আর একটি দুর্গ গড়ে তোলে। এর কিছুদিন পরেই আকবর অনুমতি দেন খ্রিস্টধর্ম প্রচার আর চার্চ গঠনের জন্য। ১৫৯৯ তে তৈরি হল এই চার্চ।

১৬৩২ সালে অর্থাৎ চার্চটি তৈরি হওয়ার তেত্রিশ বছর পর আক্রমণ করেন শাহজাহান। শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় পর্তুগিজরা। শাহজাহানের নির্দেশে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয় চার্চটি। বান্ডেলের মাটি রক্তে লাল হয়ে ওঠে। ফাদার জন দ্য ক্রুজ আর তার সঙ্গীদের বন্দি করে শাহজাহান নিয়ে যান আগ্রাতে। এক পাগলা ভয়ঙ্কর হাতির সামনে ফেলে দেওয়া হয় ফাদারকে। হাতিটা কিন্তু মারল না ফাদারকে। উল্টে শুঁড়ে করে বসিয়ে দিল পিঠে। এইরকম একটা অলৌকিক ঘটনা দেখে শাহজাহান ওই পোড়া চার্চের জমির সহ আরও অনেক বড় জমি বিনা শুল্কে দেন সেই ফাদারকে।

সেই জমির ওপর তৈরি হয় বর্তমান চার্চটি। তৈরি করেন গোমেজ ডি সোটো। যখন ১৬৬০ সালে এই চার্চটি তৈরি হচ্ছিল তখনই পাওয়া গেল পুরাতন চার্চের একটি প্রস্তরখণ্ড। যত্নে রক্ষিত সেই প্রস্তরখণ্ডটির গায়ে আজও দেখা যায় খোদাই করা আছে ১৫৯৯।

এ নিয়ে আবার আর একটা গল্প আছে। শোনা যায় যে, শাহজাহানের আক্রমণের সময় থেকে থেকে মেরি মাতার মূর্তিটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

তারপর থিয়াগো বলে একজন নাকি গভীর রাতে নদীর ওপাড় থেকে ফাদারকে ডাকে আর বলে মেরি মাতা ফিরে এসেছেন। ফাদার ভাবেন যে সেটা ছিল স্বপ্ন। কিন্তু পরের দিন সকালে একটি জেলে নদীর পাড়ে মূর্তিটি দেখতে পেয়ে ফাদারের কাছে নিয়ে আসে।

ব্যান্ডেল চার্চের প্রবেশপথে

আরও শোনা যায়, চার্চটির প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান হচ্ছিল, সেইসময় একটা জাহাজ দেখা যায় হুগলী নদী বন্দরে। জাহাজের ক্যাপ্টেন বিধ্বস্ত অবস্থায় পৌঁছালেন সেই অনুষ্ঠানে। সকলে অবাক হয়ে ক্যাপ্টেনের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন যে, বঙ্গোপসাগরে তাঁরা এক ভয়ঙ্কর ঝড়ে পড়েছিলেন, বাঁচার কোনও সম্ভাবনাই প্রায় ছিল না। ক্যাপ্টেন মেরি মাতাকে স্মরণ করলে প্রায় এক অলৌকিক উপায়ে ক্যাপ্টেন রক্ষা পান সেই ঝড় থেকে। তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করেন জাহাজের মাস্তুলটি দিয়ে দেবেন মেরি মাতার উদ্দেশ্যে। অথচ জাহাজের মাস্তুলই হল তার প্রধান অংশ যেটা ছাড়া জাহাজ চলবেই না। তবুও সেই ক্যাপ্টেন কথা রাখেন আর মাস্তুলটি দিয়ে যান এই গির্জায়। জাহাজের মাস্তুলকে ইংরেজিতে বলে মাস্ট (mast) আর মাস্ট-কে পর্তুগিজ ভাষায় বলে 'ব্যান্ডেল'।

ইমামবাড়ার ছাদ থেকে হুগলী নদী

ঢুকতেই আর্চ গেট। যার ওপর মুকুটে আছে মেরি মাতার মূর্তি আর আছে নৌকাতে ছোট্ট যীশু। চার্চে ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাওয়া যায় একেবারে ছাদে। সেখানে মূর্তি "Our Lady of the Happy Voyage"-এর । এখানে সবাই মোমবাতি জ্বালায়। তার থেকে ঠিক পিছনে ঘুরলেই অসাধারণ দৃশ্য - হুগলী নদী আর জুবিলি ব্রিজ-এর। এটি পৃথিবীর অন্যতম পুরোনো রেলব্রিজ যেটা হুগলী নদীর ওপর তৈরি হয়েছিল ১৮৮৭ সালে। রানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের গোল্ডেন জুবিলি উপলক্ষে তৈরি হয় এই ব্রিজ, তাই এই নামকরণ।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এবার প্রধান ভবন। সেখানেই "Our Lady of Holy Rosary" এর মূর্তি। আরও দুটি ভবন আছে যেখানে যীশুর ও জন বস্কোর মূর্তি আছে। এছাড়াও সারা চার্চে ছড়িয়ে আছে নানা খ্রিস্টান ধর্মগুরুর মূর্তি। আর আছে সেই মাস্তুলটার ভাঙা অংশ। লাগোয়া একটি কবরখানাও।

ব্যান্ডেল চার্চের পেছনেই হুগলী নদী। একটা নৌকা নিয়ে ইমমাবাড়ায় গেলে খুব ভালো লাগে। হেঁটে মিনিট পনেরো লাগে ইমামবাড়া পৌঁছাতে। হুগলী ইমমামবাড়া অর্থাৎ ইমামের বাড়ি। কিন্তু ভারতে এর মানে এমন একটি বাড়ি বা হলঘর যেখানে দাঁড়িয়ে মহরম দেখা যায়। সমাজসেবী হাজি মোহাম্মদ মহসিনের স্মৃতির উদ্দেশে তৈরি এই ইমামবাড়া। তৈরি করতে মোটামুটি বছর কুড়ি লেগেছিল। শেষ হয় ১৮৬১ সালে। স্থপতি ছিলেন কেরামাতুল্লা খান।

ইমামবাড়া দোতলা একটি বাড়ি। মাঝখানে আয়তক্ষেত্রাকার একটি বিশাল উঠোন। সুন্দর ভাবে সাজানো ফোয়ারা আর চৌবাচ্চাসহ। তবে এখানকার মুখ্য আকর্ষণ হল দুটি পঁচাশি ফুট উঁচু মিনার। একটি ছেলেদের জন্য অন্যটি মেয়েদের জন্য। মোট ১৫২টি বেশ উঁচু উঁচু সিঁড়ি আছে। এর ছাদ থেকেও দেখা যায় হুগলী নদীর অসাধারণ দৃশ্য আর জুবিলি সেতু। দুটি টাওয়ারের ঠিক মাঝখানে তিনতলা যে ভবনটি আছে তার একেবারে ওপর তলায় রয়েছে একটি ঘড়ি। নীচের তলাগুলিতে আছে একটি ঘন্টা আর আছে ঘড়ির যন্ত্রপাতি। তবে এই অংশটি বন্ধ পর্যটকের কাছে। উঠোনের শেষদিকের ঘরটিতে আছে অসাধারণ সব ঝাড়বাতি। আর আছে নানা রকম শিল্প নিদর্শন। উঠোনের পেছনের দিকে আছে একটি সূর্যঘড়ি।

ধীরে ধীরে কালের গ্রাসে হারিয়ে যাচ্ছে ইমামবাড়া। নষ্ট হয়ে গেছে ফোয়ারাগুলি। যে জলাশয়গুলোয় একদা কাকচক্ষু জল ছিল এখন পানা জমে সবুজ হয়ে গেছে। তবু ইমামবাড়ার ইমারতটি আজও দাঁড়িয়ে আছে। আর তার ঘড়িটি একইভাবে ছ'শ বছর ধরে সঠিক সময় দেখিয়ে পনেরো মিনিট অন্তর করে জানিয়ে দেয় তার অস্তিত্বকে।

হুগলী ইমামবাড়ার ভিতরে

পরের গন্তব্য শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিবিজড়িত দেবানন্দপুর। জন্মভিটেটি এখনও আছে। তার এক অংশে শরৎ স্মৃতি পাঠাগার ও মিউজিয়াম। রক্ষিত আছে লেখকের ব্যবহৃত জিনিসপত্র। এখানে উনিশ শতকের কিছু আটচালা টেরাকোটার মন্দিরও রয়েছে। দেখলাম প্যারিপন্ডিতের পাঠশালা, মেজদিদি গ্রন্থে উল্লিখিত সেই বিশালাক্ষী মন্দির, লেখকের বাল্য ক্রীড়াভূমি গড়ের জঙ্গল, সরস্বতী নদী সাঁকো যা বর্তমানে ব্রিজ, দাসমুন্সিদের পূজামণ্ডপ আর হেদুয়া পুকুর, দোলমঞ্চ ও আরও নানা প্রাচীন মন্দির, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের স্মৃতিফলক ও লেখকের আবক্ষ মূর্তি, মোহন মুন্সির দালান।

ফিরে আসতে আসতে কেমন একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। কালপ্রবাহে ক্ষয়ে যাচ্ছে সবই। তবু কেন যেন মনে হল আজ যা দেখলাম তার সৃষ্টি বা

বিনাশ সম্ভব নয়। যেন আগেও দেখেছি একে বারবার। আরও কতকাল কেটে যাবে। বহুযুগ পরে আগামীতে হয়তো আবারও ফিরে আসব। তবে আজকের মত বিদায়।

ম্যাকনালি ভারত ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানিতে কর্মরত উদয়ন লাহিড়ি অবসর পেলেই ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

[আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন]

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ভালো থেকো কেদার

সুমন্ত মিশ্র

~ ~ কেদারের তথ্য ~ কেদারের আরও ছবি ~

ছোটবেলায় যেদিন বিকেলে মাঠে যাওয়া হত না, বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে সূয্যি ডোবা দেখতাম! আর চোখে পড়ত একটা অবাক করা দৃশ্য - পাশের তেজপাতা গাছটা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে চড়াই কিচিরমিচির শব্দে নিচের পড়ে থাকা বালিতে ঝাঁপ দিচ্ছে, আবার গা ঝেড়ে ফড়ফড় শব্দে উড়ে লুকিয়ে পড়ছে ঘন তেজপাতার আড়ালে! কী ভালোলাগা যে জুড়ে থাকত ওদের ওই ওঠা-নামায় - আজও ভাবলে সেই আমেজটা পাই মনে মনে! মা বলেছিল, "অমন করে ওরা বালিতে চান করে" - সে তো ঠিকই, স্নান করলে যে সারাদিনের ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলা যায় সেটাতো চিরকালই অনুভব করি! কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে নিছক শরীরেরই নয়, মাঝে মাঝে মনের ক্লান্তি দূর করাটাও খুব জরুরি হয়ে পড়ে। কিছু মানুষ আছেন যাঁরা সারাবছরের মনের ওই ক্লান্তি দূর করতে বছরের কোনও না কোনও সময় পাড়ি দেন হিমালয়ের কোলে, আবার ফিরে আসেন পরের বছর যাওয়ার অপেক্ষার আনন্দ নিয়ে! নিজের অজান্তে কখন যেন আমিও সে দলে ভিড়েছি! তাই বছর বছর ছুটে যাওয়া বাঁকের পর বাঁক নেওয়া পাহাড়ি পথের নির্জন মৌনী আনন্দে! সমতলের কোলাহলকে আপন পথের পাকে ফেলে জব্দ করার এমন জব্বর কৌশল হিমালয়ের সুউচ্চ বরফ শীতল মস্তিস্ক ছাড়া আর কোথা থেকেই বা বেরোতে পারে!

২০১২-য়, যেবার বর্ষার প্রথম ধারায় ভাসিয়ে নিয়ে গেল উত্তরাখণ্ডের হাজার হাজার জীবন - অ্যাক্সিডেন্টে পা-কাঁধ ভেঙে বিছানায় ছটফট করছিলাম অসহায়ের মতো! টিভির পর্দায় একের পর এক চেনা জায়গাগুলোর নিশ্চিহ্ন হওয়ার ছবি দেখেছি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি। পাহাড়ে ঘোরার শীতল দিনগুলোয় যাদের উষ্ণতা বছরের পর বছর পথ চলিয়েছে নির্বিঘ্নে, তাদের এতবড় বিপর্যয়ের দিনে পাশে থাকতে না পারার আফশোস আমায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াবে চিরদিন! রুদ্রপ্রয়াগ, গৌরীকুণ্ড, যোশীমঠ, গোবিন্দঘাট - একটার পর একটা পরিচিত স্থানের শিউরে ওঠা দৃশ্য দেখেছি আর মনেমনে অঝোরে কেঁদেছি! তবু বোধহয় সবচেয়ে মনখারাপ হয়েছিল আমার প্রিয় কেদারের জন্যই! তাই ২০১৩-য় অমরনাথের পথে সক্ষমতার পরীক্ষায় পাশ করতেই ২০১৪-য় ফের কেদার যাওয়া স্থির করলাম।

লক্ষ্মীপূজোর পরেরদিন ট্রেন ধরলাম আসানসোল থেকে -'উপাসনা এক্সপ্রেস'। এবার একা, আগেরবার গিয়েছিলাম সদলবলে। জানলার বাইরে বিশ্বপ্রকৃতির অপার শারদ সৌন্দর্যছবি - উপভোগ করব কী, মনে ভিড় করছিল ষোল বছর আগের সেই ভ্রমণের দৃশ্যপট! 'ভুখহরতাল' বাসে চেপে বদ্রী থেকে গৌরীকুণ্ড পৌঁছনো, পথে ছবির মতো 'চোপতা' দর্শন, 'কালীকমলি' ধর্মশালায় থাকা, কেদার পৌঁছে আত্মহারা অবস্থায় হাওয়াই চটি পায়ে চারদিক ঘুরে বেড়ানো, শিবের পিতা দর্শন, চোরাবারিতালের মুগ্ধতা! - সব যেন শরতের সাদা মেঘের মতোই আমার মনের আকাশে উড়ে উড়ে আসছিল সেই মুহূর্তে! মধুপুর পেরিয়ে জসিডি আসতেই কামরায় নিত্যযাত্রীদের ভিড় বাড়ে, সংরক্ষিত আসন ভাগ করে নিই আরও অনেকের সঙ্গে। পাশে বসে থাকা গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী কিছুটা বিরক্তি নিয়েই মন দেন 'সল্টেড' বাদামে। নিত্যযাত্রীর দল বাঙালিদের বাপ-বাপান্ত করতে করতে উচ্চগ্রামে আলোচনা জোড়েন। আমি আবার কখন হারিয়ে যাই কেদারপথের নুড়িপাথর, গাছ-গাছালিতে!

'ঝাঁঝাঁ' আসতেই কামরায় ঠাসা ভিড়, কানে 'মুমফালি', 'সমোসা', 'চানা', 'চাআয়' শব্দের হুড়োহুড়ি। ওরই মাঝে নিম্ন আয়ের এক দম্পতি দুই শিশুকে নিয়ে উঠেই কিছুটা দিশাহারা হয়ে জিজ্ঞেস করেন, "ইয়ে রিজার্ভেশন কামরা হ্যায় ক্যায়া বাবু?" 'হ্যাঁ' বলতেই পড়িমরি করে ঘুরে নেমে পড়েন। আমার পাশের সন্ন্যাসী ভদ্রলোক চরম তাচ্ছিল্যে বলে ওঠেন, "এসব অশিক্ষিত লোকেদের জন্যই দেশটার এই দশা", কেমন খটকা লাগল কথাটায়! ট্রেন ছাড়তে আলাপ জমালাম গেরুয়াধারীর সঙ্গে। রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী, আছেন দেরাদুনের মিশনে। অনেক বছর দুর্গাপুজো দেখা হয়নি বলে এবার পুজো কাটিয়ে গেলেন আসানসোলে। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করি - "মহারাজ, শিক্ষা-অশিক্ষার পার্থক্য করেন কীভাবে?" একটু থতমত ভাব দেখে নিজেই সহজ করি, স্মরণ করাই, তাঁর কিছুক্ষণ আগে বলা কথাক'টি! এবার মহারাজ বেশ স্বাভাবিক হয়েই বলেন - "আর দশজন যেভাবে করে সেভাবেই!" তাইতো! কিন্তু যাঁকে দেখে এই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী মানুষটিরও মনে অশিক্ষার যন্ত্রণা উদয় হয়েছিল তিনি কি আদৌ অশিক্ষিতের মতো কোনোও আচরণ করেছিলেন? প্রশ্ন জাগে আমার! তেমন তো মনে হয়না, বরং কিছু সুবেশ সহযাত্রী, যাঁরা সাধারণ টিকিটে এই সংরক্ষিত কামরায় উঠে বৈধ যাত্রীদের অসুবিধার সৃষ্টি করেছেন তাঁদের চেয়ে তিনি সুশিক্ষারই পরিচয় রেখেছেন। প্রৌঢ়ত্বের দ্বারে এসে একটা কথা অন্তর থেকে বিশ্বাস করি জীবনে প্রকৃত শিক্ষার কোনোটার জন্যই স্কুল, কলেজ অথবা ইউনিভার্সিটির দরকার পড়েনা, বাড়ি কিংবা পরিবেশই তার জন্য যথেষ্ট!

এসব হাবিজাবি ভাবতে-ভাবতেই 'পাটনা'। উহ্, সে এক দুঃসহ অভিজ্ঞতা! মিনিটের মধ্যে পিলপিল করে ওঠা ছেলের দল 'দখল' নিল কামরার! কিছু বুঝে ওঠার আগেই সর্বত্র জাঁকিয়ে বসল তারা, আমরা আক্ষরিক অর্থেই হতবাক! ট্রেন ছাড়তে প্রশ্ন করে জানলাম, সকলেই একটি চাকরির পরীক্ষা দিতে দেরাদুন যাচ্ছে। বুঝলাম ভোগান্তি পুরো রাস্তাটাই! কিন্তু বিশ্বাস করুন রাগ হলনা, বরং কিছুটা মায়াই হল ওই কচি মুখগুলো দেখে! আমার দেশের জীবন সংগ্রামের এও এক করুণ চালচিত্র!

হরিদ্বার স্টেশনে পৌঁছলাম নির্ধারিত সময়েই। কাঁধে বোঁচকা ফেলে সোজা হাঁটা দিলাম 'মিশ্র ভবন' -সেদিনের মতো আমার রাতের আশ্রয়স্থল। পুরনো লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে ঢুকলাম নিজের বরাদ্দ ঘরে। তারপর জমিয়ে গঙ্গাস্নান, শীতল জলধারায় ধুয়ে গেল দু'দিনের সকল শ্রান্তি! ঝরঝরে হয়েই সেরে নিলাম কিছু টুকিটাকি কেনাকাটা,'দাদাবৌদির হোটেল'-এ রাতের খাওয়া সেরে আটটার মধ্যেই বিছানার নরমে ডুব!

পরদিন সকাল সকাল নাওয়া-খাওয়া মিটিয়ে বাসে সওয়ারি হয়ে রওনা দিলাম হৃষীকেশ - ঘড়িতে সাড়ে সাতটা। ক'টায় বাস পাব, কী রকম সিট পাব - এসব ভাবতে ভাবতেই হৃষীকেশ। সাড়ে আটটায় স্ট্যান্ডে নেমে স্যাক্ কাঁধে নিতেই কানে আসে "গুপ্তকাশী গুপ্তকাশী" আওয়াজ! গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা বাসের দিকে নজর পড়তেই হাত উঁচিয়ে ছুট দিই! সামনে জানলার ধারের সিটে বসে কেন জানিনা সবকিছুতে কেদারনাথেরই অদৃশ্য সহায়তা অনুভব করি! চোখবন্ধ করে স্মরণ করি তাঁকে! বাসের ভেতরেও সমস্বরে ধ্বনি ওঠে, -"জয় বাবা কেদারনাথ"!

হৃষীকেশ - লছমনঝুলা

বাস চলতে শুরু করে, একটু পরেই দৃশ্যমান হয় গঙ্গার পান্নাসবুজ জলধারা -আহা, কতবার দেখেছি এই মনোরম সবুজ স্রোত! তবু আজও যেন সেই প্রথম দেখার মতোই আনন্দে উদ্বেল হয় মন, র‍্যাফটিং-এর ভেলার মতোই মনে মনে ভেসে যাই ওর টুকরো টুকরো ঢেউয়ে।

দেবপ্রয়াগ পৌঁছতেই তান্ডবের কিছু নিদর্শন চোখে পড়ল - নিচেরদিকে থাকা বেশ কিছু বাড়িঘরের শুধুমাত্র ভগ্নাবশেষটুকু পড়ে আছে, আছে দু'নদীর মিলনস্থলে (অ)সভ্যতার আর্তনাদ, আছে মানবদম্ভের হাঁটুমোড়া আত্মসমর্পণ! আগে কেদার-বদ্রী যাত্রীদের বাস দেবপ্রয়াগেই মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য দাঁড়াত, সে ছিল এক বাড়তি পাওনা -সুগন্ধি সরু চালের গরম ভাত আর চাপচাপ অড়হর ডাল, সঙ্গে পাহাড়ি সব্জি, মুখে লেগে আছে আজও! এখন অবশ্য সে পর্ব আরও কিছুটা আগেই সারা হয়, পরিবর্তিত স্থানে তন্দুরি রুটি আর পরোটারই রমরমা! দেবপ্রয়াগেই ভাগীরথী পেরিয়ে কেদার-বদ্রীর রাস্তা ডানদিকে বাঁক নেয় অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর মিলিত জলধারাকে ডানহাতে রেখে। প্রায় সাড়ে বারোটায় পৌঁছই শ্রীনগর, গাঢ়োয়ালের সবচেয়ে বড় জনপদ। কোনও একবার বৃষ্টিশেষে রামধনু ছোঁয়ার সাধ মিটিয়েছিলাম এই শহরেরই গায়ে, সেইথেকে এই শহর আমার কাছে 'স্পেশাল', সাত রঙয়ে বর্ণময়! স্ট্যান্ডে বাস দাঁড়াবে কিছুক্ষণ, নেমে দাঁড়াই। রবিবার, আজ ব্যস্ততা কিছু কম, যাত্রীর সংখ্যাও। তিন-চারজন নতুন যাত্রী উঠতেই বাস আবার ছাড়ল। একটু এগোতেই চোখে পড়ল প্রকৃতির রোষে অগাধ জলে হাবুডুবু খাওয়া শ্রীনগর হাইড্রাল প্রোজেক্টের নবনির্মিত ভবনগুলি, আরও একটু দূরে দেখি সখাত সলিলে মুখ লুকানো এক আস্ত সেতু! মনে পড়ল দুর্ঘটনার একমাস পর উত্তরাখণ্ড সরকার এই 'প্রজেক্ট' টি বাতিল করার কথা ঘোষণা করেছিলেন। কোথায় কী - এ তো দিব্যি আবার কাজ শুরু হয়েছে! ভালো, অতীতের ভুল থেকে 'শিক্ষা'-ই যদি নেব তবে আর ভারতবাসী কেন!

আড়াইটে নাগাদ পৌঁছলাম রুদ্রপ্রয়াগ, বাস দাঁড়াল। এখানে 'চা'য় পি লো' বলে ড্রাইভার সাহেব অজ্ঞাতবাসে গেলেন। নামলাম আমিও, বাসে বসেই মনস্থির করে ফেলেছি - আজ গুপ্তকাশীতেই রাত্রিবাস। সেইমতো স্থানীয়দের কাছে কিছু খোঁজখবর নিয়ে জানলাম, বাসস্ট্যান্ড থেকে ওপরে মিনিট পাঁচেক হাঁটলেই জি এম ভি এন গেস্ট হাউস। সেখানে থাকার বাড়তি সুবিধা এই যে, নতুন নিয়মে কেদারযাত্রীদের 'বায়োমেট্রি' টেস্টের ব্যবস্থাও ওখানেই আছে। পরদিন শোনপ্রয়াগে গিয়ে সময় নষ্ট না করেই এগিয়ে যাওয়া যাবে। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে বাস ছাড়ল প্রায় সাড়ে তিনটেয়। অগস্ত্যমুনি নালা পেরিয়ে গুপ্তকাশী যখন পৌঁছলাম তখন সাড়ে পাঁচটা। নেমেই স্যাক পিঠে নিয়ে জোরে হাঁটা দিলাম - শুনেছি বায়োমেট্রির 'কাউন্টার' ছ'টা পর্যন্ত খোলা থাকে! মিনিট সাতেক লাগল লজে পৌঁছতে। দেখি, ডাক্তারবাবু বাড়ি যাওয়ার গোছগাছ শুরু করেছেন। মুখে একটা ক্যাবলা হাসি ঝুলিয়ে নিজের পরিচয় দিই। ভদ্রলোক আমার চেয়ে বয়সে বেশ কিছুটা ছোটই হবেন, হাসি মুখেই আমার শারীরিক পরীক্ষা সারেন। বলেন, "পালস্ রেট থোড়া হাই হ্যায়, আপকা সুগার নরম্যাল হ্যায় তো?" বুঝিয়ে বলি, তাড়াহুড়ো করে ওপরে উঠে এসেছি বলেই এই বিপত্তি, সুগার-টুগার কিছু এখনও হয়নি বলেই জানি! সমস্যা মিটল, টেস্টের সফল কাগজপত্র হাতে নিয়ে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করি। সূর্য ডুবছে, সোনারঙে সেজে উঠছে হিমালয়ের সারিবদ্ধ শ্বেতশুভ্র শিখরমালা, এখন কি ঘরে থাকা যায়! - ক্যামেরা হাতে বেরিয়ে আসি বাইরে। চুপটি করে বসে থাকি এক কোণে, আপনিই মনে আসে, "তোমার দুয়ার হতে কেহ না ফিরে / যে আসে অমৃত পিয়াসে।"

সূর্যাস্তের আগে – গুপ্তকাশী

ঘুম ভাঙল যখন, বাইরে গাঢ় অন্ধকার, মোবাইলে দেখলাম, ভোর পাঁচটা। কম্বলের উষ্ণ সোহাগ সরিয়ে উঠে পড়লাম। উইন্ডচিটার গায়ে দিয়ে, গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে সোজা বাইরে। দূরে উল্টোদিকের পাহাড়ের গায়ে উখিমঠের ঝকমকে উপস্থিতি! এ পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে তখনও ফিকে হওয়া রাত্রির ছোপ, রাতঘুমে নিশ্চল গাড়ির কাঁচে গড়িয়ে পড়া শিশিরের আলপনা। চারদিক নিস্তব্ধ, নিজের পায়ের শব্দটুকুই শুধু কানে আসে! ধীরে ধীরে আলো ফোটে, উত্তরের দিগন্ত জুড়ে প্রকাশিত হয় বরফঢাকা শিখরের সারি, বয়ে যাওয়া সময়ের তালে তারা রঙ পাল্টায়, সেই খেলা একমনে দেখি! কতক্ষণ? হিসেব থাকেনা, শুধু মনেমনে গুনগুন করি - "এসো হে আনন্দময়, এসো চিরসুন্দর।।"

গুপ্তকাশী ছাড়লাম সকাল সাড়ে আটটায়, শেয়ার জিপে সওয়ারি, গন্তব্য শোনপ্রয়াগ। আসার আগে গুপ্তকাশীর জি এম ভি এন লজের ম্যানেজার রাওয়াত বাবু সহৃদয় হয়ে গৌরীকুণ্ডের পান্ডেজিকে একটা চিঠি লিখে দিলেন, বার বার অভয় দিলেন কেদার পথের! পথে নেমে এঁদের শুভেচ্ছাই যে সবচেয়ে বড় পাথেয়! পথে পড়ল 'ফাটা', এখান থেকেই শুরু হয়েছে নতুন উৎপাত -হেলিকপ্টার পরিষেবা! জানিনা এখানেও এর কি প্রয়োজন ছিল! তৈরি হচ্ছে বড় বড় হোটেল, লজ - 'বিশিষ্ট' যাত্রীদের থাকার সুবন্দোবস্ত! জিপ চলছে, প্রাণভরে দু'ধারের প্রকৃতিকে দেখছি, তবে শিউরে উঠছি মন্দাকিনীর প্রতিটা বাঁকে বাঁকে, অনুমান করার চেষ্টা করছি কী বিপুল প্রত্যাঘাত এসেছিল সেদিনের সেই রাতে! একসময় পৌঁছে যাই শোনপ্রয়াগ। প্রথম পর্যবেক্ষণে মনে হয় পরিত্যক্ত কোনও জনপদ, যেন বিপুল ধ্বংসের মাঝে গুটিকয়েক প্রাণের স্পন্দন! জিপ দাঁড়াল কেদারযাত্রীদের স্বাগত জানানো এক তোরণের সামনে। মালপত্র নিয়ে এগোতেই শুরু হল সিকিউরিটি চেকিং, পাশেই থানায় গিয়ে দেখাতে হল পরিচয়পত্র ও বায়োমেট্রি টেস্টের ছাড়পত্র, সাকুল্যে লাগলো মিনিট দশ। ব্যস্, এখান থেকেই শুরু হোলো পথিকের পথ চলা - কেদারের আপন অন্দরে!

পথ কোথায়? সামনের বিস্তীর্ণ অংশ যেন শতসহস্র পাথরের প্রদর্শনী - যেন আস্ত একটা পাহাড় ভেঙে পড়ে আছে শোনপ্রয়াগের পদতলে। মনে হয় যেন মন্দাকিনীর জলধারায় ভেসে আসা সহস্র মানুষের কান্না চাপা পড়ে আছে সেই ভেঙে পড়া পাহাড়ের বড় বড় পাথরের নিচে! ওরই মাঝে নতুন রাস্তা গড়ে উঠেছে, - গৌরীকুণ্ডের পথ, দূরত্ব ৬ কিমি। আগে এপথেও যান চলাচল ছিল, বাসে চেপে সোজা নামা যেত গৌরীকুণ্ডে। যাত্রী নেই, যতদূর দৃষ্টি যায় কেউ কোথাও নেই, আমি একলা পথিক! দেবতার গর্ভগৃহের পথে সচরাচর এমন তো হয় না, এ দৃশ্য তাই একেবারে নতুন! তবে আমি তো দেবদর্শনে আসিনি, সবুজে ছাওয়া ভেজা নুড়ির রাস্তা আর একান্ত প্রকৃতি আমায় যেন ঘোর লাগিয়ে দিল! মন্দাকিনীর সুর,

ঝরে পড়া পাতার কথা, পাখির গান - পথের শ্রম দিল ভুলিয়ে! মনে এল প্রিয় কালকূটের লেখা একটা লাইন, - "সমতলের ছেলে, হিমালয় আমাদের কাছে চিরবিস্ময়ের।" বিস্ময়ই বটে, এত বছরেও এ বিস্ময় আর কাটল না! বিস্মিত হয়েই এগিয়ে চলেছি, দূরে যেন কারও নেমে আসার আভাস! হ্যাঁ, তাইতো, কোনও গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী যেন ভোরালের চাঞ্চল্য নিয়ে নেমে আসছেন! কয়েক মিনিটেই মুখোমুখি, সোজা এসে আমার হাত দু'টি নিলেন নিজের দু'হাতে, - "কেদার যাচ্ছেন?" পরিষ্কার বাংলায় এমন প্রশ্ন শুনে আরও বিস্মিত হই! উত্তর দিই - হ্যাঁ। "চলে যান, কোনও অসুবিধা হবে না, সন্ধ্যের আগেই পৌঁছে যাবেন।" হেসে বললাম, আজ গৌরীকুণ্ডেই থাকব। "সেকি, গৌরীকুণ্ড তো আর পাঁচ মিনিট, এখনও এগারোটাই বাজেনি, যান যান আজই ঠাকুর দর্শন করে নিন!" - বেশ আন্তরিকতার ছোঁয়া ছিল ওঁর কথায়। বললাম, ঠাকুর দর্শন করতে তো আসিনি, এসেছি ওঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা কেমন আছেন তাই দেখতে! সে কথায় গুরুত্ব না দিয়েই বললেন, -"হ্যাঁ হ্যাঁ অমন সবাই বলে!" ভারী ভালো লাগল মানুষটির সঙ্গে আলাপ হয়ে, নাম জয়দেব মহারাজ, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী, আছেন শোনপ্রয়াগ আশ্রমে। যাওয়ার আগে বারবার অনুরোধ জানালেন ফেরার পথে যেন দেখা করি, যদিও সে অনুরোধ শেষপর্যন্ত রাখা হয়নি।

আজকের গৌরীকুন্ড

যার সামনে দাঁড়িয়ে আছি সেটাই যে গৌরীকুণ্ড বিশ্বাস হয়না! খুব চেনা, আবার খুউউউব অচেনা! অনেকটা 'সোনার কেল্লা' দেখা মুকুলের অবস্থা আমার! যা-ই দেখতে যাই, ভাবি, হ্যাঁ এখানেই তো ছিল এটা, দেখি না, এখন আর নেই! ভেঙে যাওয়া দরজা-জানলা দিয়ে যেন এখনও কান্নার রোল ভেসে আসছে! কী নির্মম আক্রোশে প্রকৃতি সে রাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই অসহায় জনবসতিতে ভাবলে এখনও বুক ছ্যাঁত করে ওঠে! ভেঙে পড়া বাড়ি আগেও দেখেছি, কিন্তু ছিঁড়ে যাওয়া বাড়ি দেখলাম এই প্রথমবার! প্রায় আধঘন্টা ঘুরে ঘুরে শুধু ষোলো বছর আগে ফেলে যাওয়া জায়গাটাকে তন্নতন্ন করে খুঁজেছি, নাহ্, সব ধুলিসাৎ! একরাশ হতাশা আর কষ্ট নিয়ে গেলাম পান্ডেজির কাছে, নতুনভাবে গড়ে তোলা লজে রুম নিলাম। স্নান করে পাশের ভান্ডারায় খাওয়া সেরে লজে ফিরতেই আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামল! পাহাড়ে হাঁটাপথে মেঘ দেখলেই দুশ্চিন্তা, এখানে যেন একটু বেশিই হল! সারাদিন কেদারের পথের দিকে চেয়ে বসে রইলাম, সন্ধের মুখে দু'তিনজন ওপর থেকে নেমে এলেন। বৃষ্টি কমেছে, কিন্তু বেড়েছে ঠান্ডা, ভান্ডারায় খেতে গেলাম রাত্রি সাতটাতেই। হ্যাজাকের আলোয় খাওয়া বেগুনের তরকারি আর লুচির স্বাদ মনে থাকবে চিরকাল! সকাল সকাল বেরোব ভেবে শুয়ে পড়লাম আটটাতেই!

পরদিন সকাল, বৃষ্টি নেই তবে আকাশে টুকরো টুকরো কালো মেঘের আনাগোনা। সাড়ে সাতটায় ভান্ডারায় চা খেয়ে 'জয় কেদার' বলে হাঁটা দিলাম। বাঁধানো রাস্তা, তাও রেলিং দিয়ে ঘেরা, রাস্তায় নিয়ন আলো, সবকিছুই আগের মতো! শুধু আগেরবার এই রাস্তাই ছিল জনাকীর্ণ আর এবার প্রকৃতই জনশূন্য! প্রায় ঘন্টাখানেক হাঁটার পর নীচ থেকে টুংটাং শব্দ কানে আসে, রেলিং ধরে নিচের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ে খচ্চরের পিঠে সওয়ারি এক যাত্রীদল। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লক্ষ্য করি বেচারিরা শ্যামবাজার পাঁচমাথার নেতাজির মতো কাঠ হয়ে বসে আছেন! ওঁরা চলে যেতেই আবার সব শুনশান, ছবি নিতে নিতে এগিয়ে চলি। প্রায় দুঘন্টা হেঁটে পৌঁছই 'ভীমবালি'। ভীমবালি আদতে রাস্তা সারাইয়ের কুলি-মজুরদের অস্থায়ী আস্তানা, গাড়োয়াল মন্ডল বিকাশ নিগম সেখানেই যাত্রীদের থাকার ক্যাম্প ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছেন। একটু আগেই টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি শুরু হয়েছে তাই ভীমবালি পৌঁছেই আশ্রয় খোঁজ করে সোজা ক্যান্টিনে ঢুকি। সেখানে তখন এক বিদেশি পর্যটক দলের জমজমাট উপস্থিতি। বেশ ঠান্ডা, সামনে ধোঁয়া ওঠা গ্লাসে গরম চা দেখে নিজেরও ওই উষ্ণতার স্বাদ পেতে ইচ্ছে করল। কিন্তু ক্যান্টিনের ছেলেটি পরিষ্কার জানিয়ে দিল, বিদেশি অতিথিদের 'সেবা' সম্পূর্ণ না করে সে আমাকে চা দিতেও অপারগ! ত্বকের রঙের রকমফেরে যে "বসুধৈব কুটুম্বকম্"-এরও রকমফের ঘটে! বসে রইলাম প্রায় মিনিট কুড়ি, খিদেও পেয়েছে অল্পবিস্তর, আবার অনুনয় করি চায়ের। এবারও সেই একই উত্তর। নাহ্, আর মাথা ঠান্ডা রাখা গেলনা! - বললাম, জয়(ততক্ষণে নাম জেনেছি), উও সির্ফ আপকা গেস্ট নেহি হামলোগোকা ভি গেস্ট হ্যায়, লেকিন ম্যায়ভি তো আপকা গেস্ট হুঁ, অউর এক বাত বাতাইয়ে- আপ ক্যায়া ভুখা পেট উনলোগোকো খিলা রহে হো? আগর পাঁচ মিনিটকা অন্দর মুঝে চা অউর নাস্তা না মিলা তো ম্যায় কিসিকো খানে নেহি দুঙ্গা! এবারে আর পাঁচ মিনিটও অপেক্ষা করতে হয়নি, তার আগেই চলে এল চা আর ছোলাসেদ্ধ! ততক্ষণে বৃষ্টিও কমে এসেছে, জয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে আবার পথে পা রাখা।

পুরোনো পথ ছেড়ে নতুনে পা - মন্দাকিনীর সেতু

মিনিট দশ হেঁটেই মন্দাকিনীর সেতু, এখান থেকে শুরু কেদারের নতুন পথের। আগে বাঁদিকের এ পথই সোজা উঠে যেত রামওয়াড়া হয়ে। সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে ওপর দিকে তাকালাম রামওয়াড়ার দিকে - নিশ্চিহ্ন, পুরোনো কেদারপথের সবচেয়ে বড় ও ব্যস্ত জনপদ পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন! একবুক কান্না এসে চোখ ভিজিয়ে দিল। কত প্রাণ যে সেদিনের বলি তার হিসেব কেউ জানবেনা কোনোদিনও! চোখ মুছে হাঁটা দিলাম নতুন পথে। এপথে মন্দাকিনীকে বাঁদিকে রেখে চলা, প্রশস্ত পথ, পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেবার জায়গা - সবমিলিয়ে কেদারপথের পথিকের জন্য অত্যন্ত সুব্যবস্থা। শুধু আগের পথের থেকে চড়াই কিঞ্চিৎ বেশি, জায়গায় জায়গায় তারই বিজ্ঞাপন - "উচ্চ মার্গ, ধীরে চলেঁ"। তবে এ রাস্তায় জলদি চলে কার সাধ্যি! প্রায় দেড়ঘন্টা চলে পৌঁছলাম 'লিনচুলি'। ঠিক ঢোকার মুখেই নামল তুমুল বৃষ্টি, কোনোরকমে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকলাম একটা খচ্চরের আস্তানায়। মিনিট চল্লিশেও বৃষ্টি না থামলে একদৌড়ে জি এম ভি এন ক্যান্টিন। সেখানে জনা পাঁচ-ছয় সাধু আর কিছু নেপালি দিনমজুর ছাড়া কাউকে চোখে পড়লনা! চড়াই ভেঙে উঠে আসার ক্লান্তি আর তারপর জামা-গেঞ্জি সব ভিজে সপসপ করছে, সঙ্গে কনকনে ঠান্ডা, হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। স্যাক্ খুলে তাড়াতাড়ি পাল্টে নিই জামাকাপড়, গরম চায়ে চুমুক দিয়ে ধাতস্থ হই! নজর যায় সাধুদের দিকে, সকলেরই উদ্বিগ্ন মুখ! কাছে গিয়ে আলাপ করি। তিনজন বেলুড়

মঠের সন্ন্যাসী, বাকি দুজন অন্ধ্রের ও অন্যজন বিহারের সমস্তিপুরের বাসিন্দা। বেলুড়ের ওঁরা বাঙালি, বয়স কম (৩০-৩২এর মধ্যে), সদ্য গেরুয়া পেয়েছেন, কেদার দেখে আজ নিচে নামছেন। এই প্রথম হিমালয় দর্শন, তাও আবার দুর্যোগ সঙ্গী, স্বভাবতই একটু উদ্বেগেই আছেন। বাকিরা সবাই আমার মতোই আজ কেদার দর্শনে চলেছেন। টিনের চালে বৃষ্টির ঝুমঝুমি সঙ্গতে সাধুসঙ্গ জমে উঠল! বেলা প্রায় দুটো নাগাদ সিদ্ধান্তে এলাম - আজ লিনচুলিতেই থাকছি।

ক্যান্টিনের দরজায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির মতি-গতি বোঝার চেষ্টা করছি - বেলুড়ের ওঁরা কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, -"কি করি বলুনতো?" অভয় দিয়ে বললাম, আপনাদের সঙ্গে যখন 'রেনকোট' আছে ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়ুন, নিচের দিকে বৃষ্টি আর জোরে নামবে বলে মনে হয়না, যদি নামেও ভীমবালিতে থেকে যাবেন! ওঁরা একটু ইতস্তত করেও শেষমেষ পা বাড়ালেন। আমি 'চাউল অউর কালি ডাল' দিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সেরে নির্ধারিত টেন্টে ঢুকলাম। বেশ ভালো ব্যবস্থা। অন্তত পনেরোজন থাকার মতো জায়গা, নিচে ম্যাট্রেস পাতা, আর এক কোণে রয়েছে অন্তত কুড়িটা স্লিপিং ব্যাগ। সত্যি কথা বলতে এত ভালো স্লিপিং ব্যাগ এর আগে দেখার সৌভাগ্য হয়নি। কেদার পথের বাকি তিনজন সাধুও রয়েছেন পাশের তাঁবুতে - বৃষ্টির অবসরে ওঁদের কথার আওয়াজ কানে আসে। আমি ভিজে জামা-জুতো, স্যাক এসবের হিল্লে করে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকি। চরম ঠান্ডায় হাত-পা জমে অসাড় - ঘষে ঘষে সাড় ফেরাই! বাইরে দুর্যোগ আরও বাড়ে, সোঁ সোঁ হাওয়া। বিকেল চারটেতেই আঁধার তার কেশভার এলিয়ে দিল লিনচুলির বুকে!

কতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা, হঠাৎ তাঁবুর মধ্যে হইচইয়ে ধড়মড় করে উঠে বসি! নবাগত যাত্রীদল, সাকুল্যে পাঁচজন। একজন ষাটোর্ধ, বাকিদের বয়স কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে। আমি উঠে বসতেই একজন 'হ্যালো আঙ্কেল' বলে পরিচয় সারেন। ওঁরা নিজেদের গুছিয়ে নিলে, আলাপ করি! এঁরা আসছেন বাঙ্গালোর থেকে। চার বন্ধু ও তাঁদের একজনের বাবা এসেছেন কেদার দর্শনে। বেলা বারটায় গৌরীকুণ্ড থেকে হেঁটে পৌঁছেচেন এখানে! একে চড়াই তার ওপর এই দুর্যোগ পেরিয়ে এসে বেশ পরিশ্রান্ত। শুরুতেই একটা কথা জিজ্ঞাসা করে নিই, আপলোগ রাস্তে মে তিন সাধুসে মিলেথে? সদর্থক উত্তর পেতেই বলি, কাঁহা? জানালেন, - "ভীমবালি কে আগে।" ওহ্, বুকের ওপর থেকে একটা বোঝা নামল। সকালে সেই সন্ন্যাসীদের রওনা হওয়ার পরে থেকেই দুশ্চিন্তা ছিল, যাক্ এখন স্বস্তি। দুপুরেই শুনে এসেছি রাত সাড়ে আটটায় ক্যান্টিন বন্ধ! আটটা বাজে দেখে এবার ওঁদের সঙ্গে নিয়ে তাড়াতাড়ি হাজিরা দিই ক্যান্টিনে! রুটি আর 'পিলা ডাল' দিয়ে রাতের খাওয়া চুকিয়েই আবার তাঁবুতে ফেরা। সেখানে তখন আমাদের জন্য অপেক্ষারত এক নতুন বন্ধু! নতুনই বা বলি কেন, ভীমবালি থেকে লিনচুলি সারাটা পথে তো ওই আমার সঙ্গী ছিল! 'ধলু', ভল্লুক সদৃশ একটি সাদা সারমেয়। সকলে ওকে দেখে বিরক্ত হলেও টেন্টে সিনিয়র হওয়ার 'ভেটো' প্রয়োগ করে ওকে রাত্রির সঙ্গী করলাম! বাইরে প্রকৃতির সশব্দ আক্রোশ, ভেতরে উদ্বিগ্ন সাতটি প্রাণ! দুর্গাপুর থেকে যখন বেরিয়েছিলাম তখনই 'হুদহুদ্' নামের এক সাইক্লোন আসার খবর দেখে এসেছিলাম। ভাবিইনি দুহাজার কিমি উত্তর-পশ্চিমে পৌঁছেও এভাবে তার মুখোমুখি হতে হবে! 'চিন্তা' যখন 'দুশ্চিন্তা' হয় তখন চিন্তামুক্ত থাকাটাই বরাবরের অভ্যাস, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলনা - নিজেকে স্লিপিংব্যাগে পুরে ঘুমিয়ে পড়লাম! "আরে রাম" -ঘুম ভাঙল এই শব্দে! উঠে দেখি পাঁচজনই খাড়া হয়ে বসে আছেন, চোখে ঘুমের বদলে উপচানো ভয়! আমাকে উঠতে দেখেই একজন বলে ওঠে, "ক্যায়া হোগা আঙ্কেল? লাগ রাহা হ্যায় ইয়ে টেন্ট উখাড়কে ফেক্ দেগা!" সত্যিই বাইরে তীব্র হাওয়ার বেগ যেন তাঁবুর শক্তি পরীক্ষা নিতে নেমেছে! কিন্তু ভালো করে কান পেতে মনে হল বৃষ্টি বুঝি থেমেছে! তাঁবুর জানলার চিটপটিটুকু খুলে মাথা বার করে আকাশের দিকে তাকাতেই মনে বল পেলাম - ওইতো এককোণে একটা তারা দেখা যাচ্ছে, বৃষ্টিও থেমেছে। এবার হেসে ওঁদের বললাম - শো যাইয়ে, বাদল ফাট্ চুকা, লাগ রাহা হ্যায় সুবহা তক্ মৌসম সাফ হো যায়েগা! প্রায় পঁচিশ বছর ধরে পাহাড়ে আসার অভিজ্ঞতা আমাকে এটুকু আভাস দিল!

বরফে ঢাকা 'মন্দির মার্গ'

অ্যালার্ম ছিল চারটেয়, উঠে পড়লাম। আধঘন্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিয়ে ঠিক পাঁচটায় লিনচুলির ঘন অন্ধকারে বরফমোড়া পথে পা বাড়ালাম মচ্ মচ্ শব্দে। এক আকাশ তারা চোখ মিটমিট করে ঝলমলে হাসল! মিনিট দশ চড়াই উঠেই যেন ম্যাজিক - চারদিক শুধু সাদা-ই সাদা! দুর্যোগশ্রান্ত, অন্ধকারঘন কালো পৃথিবী যেন সাদা চাদর গায়ে গভীর ঘুমে মগ্ন। সকালে উঠে গায়ত্রীমন্ত্র জপ বহুদিনের অভ্যাস - ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ, আমি বিশ্ব ভুবনের অধিবাসী - এই কথাটা আজ সত্যি হয়ে মনের মধ্যে উচ্চারিত হল। বুকে হাঁফ, পিঠে ঘাম নিয়ে এক পা এক পা করে এগিয়ে চলেছি - নিরন্তর ওঠা! ভোরের আলো ফুটছে, দৃষ্টি প্রসারিত হচ্ছে, আহ্, এই জন্যই তো এত আশঙ্কা, এত বিঘ্ন জেনেও এপথে পা বাড়ানো! জীবনের সব গ্লানি, সব দৈন্যের মুক্তি যেন এক লহমায়, প্রণত চিত্ত যেন আপনিই করজোড় করে! অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, ফড়ফড় শব্দে সম্বিত ফেরাল একটা মোনাল, শুভ্র প্রকৃতির একটুকরো রঙিন বৈচিত্র্য - ফ্রেমবন্দি করার আগেই গেল হারিয়ে! এখানে রাস্তা একটা 'ইউ টার্ন' নিয়ে কিছুটা খাড়া উঠে গেছে, - উঠেই প্রকাশিত কেদারের প্রশস্ত ভ্যালি। কী নয়নাভিরাম দৃশ্য! বরফমোড়া প্রান্তরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে কেদার মন্দিরের চূড়া, পেছনে সারিবদ্ধ শৃঙ্গমালা - সকালের সোনারোদে সেখানে মুকুটের প্রান্তবদল ঘটছে! এ প্রান্তে করুণ আর্তি - "ওই যে আলোক পড়েছে তাঁহার উদার ললাটদেশে, / সেথা হতে তারি একটি রশ্মি পড়ুক মাথায় এসে!" মন্দির থেকে ভেসে আসছে শিবস্তোত্র পাঠ - সত্যিই এ এক অপার্থিব অনুভূতি! রাস্তার ওপরে জমে যাওয়া বরফ বেশ শক্ত, পা পিছলে যাচ্ছে বারবার, আছাড়ও খেলাম বারদুয়েক! নাহ্, আর ঝুঁকি নিলাম না, শরীরের চেয়েও ক্যামেরার মায়া বেশি - রাস্তার পাশে নরম বরফে নেমে হাঁটতে থাকলাম! প্রায় সোওয়া ছ'টা বাজে, রাস্তায় এক-দু'জনের দেখা মিলছে -বেশিরভাগই সেনা আধিকারিক। 'সুপ্রভাত' বিনিময় করতে করতে এগিয়ে চলা। প্রায় সাড়ে ছ'টা নাগাদ পৌঁছে গেলাম ধ্বংসলীলার কেন্দ্রস্থলে - কেদার। হিমরাজ্যের অন্তরাত্মা!

এ কোন কেদার! সেই বড়বড় অট্টালিকা ঘেরা দেবদালান! এই হাল হয়েছিল তবে কেদারের! দেবতার অলিন্দে সার বেঁধে শুয়ে থাকা বাড়িঘর - সে সবই তো কোনও আশ্রম কিংবা সঙ্ঘের সম্পত্তি। লোভ তাহলে পিছু ছাড়েনি ওঁদেরও! 'লোভে পাপ,পাপে মৃত্যু' - ঠিক কত প্রাণ গেলে হৃদয়ঙ্গম হয় একথা? উত্তরটা হয়ত দিতে পারবেন গেরুয়া বসন ম্যানেজার ওরফে 'মহারাজ'-এর দল-ই! মিথ্যে বলবনা, সারাটা রাস্তা উঠে এসেছি যে কষ্ট বুকে চেপে, এখানে এসে তাতে কিছুটা খুশির প্রলেপই পড়ল!

আজ আবহাওয়া অনুকূল, তাই সকাল সকাল চালু হয়েছে হেলিকপ্টার পরিষেবা! বেশকিছু সচ্ছল যাত্রী নিয়ে কেদার ভূখন্ডে তাঁদের সফল অবতরণ! কোথায় শান্ত-স্নিগ্ধ প্রকৃতি, নিমেষে সেসব খানখান, চারদিকে উচ্চকিত অর্থের আস্ফালন! দেবদর্শন সারি। ঘুরে ফিরে দেখি কেদার সাম্রাজ্যের ভগ্নরূপ। সময় পেরিয়ে যায়, একসময় ফেরার পথে পা বাড়াই।

এক কথায় কিভাবে প্রকাশ করব এবারের কেদার দেখাকে? 'নতুন পথে কেদার দর্শন?' না না, সেটা হয়ত ঠিক হবেনা! 'ধ্বংসলীলার কেদারভূম?' উঁহু, এটাও ঠিক মনে ধরছে না! বরং বলতে পারি,'দেবতার আত্মরক্ষা!' ভালো থেকো কেদার।

~ কেদারের তথ্য ~ কেদারের আরও ছবি ~

সেলফ্ এমপ্লয়েড - 'হরফ' নামে একটি প্রিপ্রেস ইউনিট চালান সুমন্ত মিশ্র। হিমালয়ের আতিথ্য গ্রহণ ও ফুটবল খেলার দৃষ্টিসুখ তাঁকে অসীম তৃপ্তি দেয়! ভালোবাসেন রবি ঠাকুরের গান শুনতে, প্রবন্ধ পড়তে, ছোটগাছকে বড় করতে, বেড়াতে আর নানারকমের মানুষের সাহচর্য পেতে। ইন্টারনেটের দুনিয়ায় 'আমাদের ছুটি' কিছু সমমনস্ক মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ করে দেওয়ায় আনন্দিত হয়েছেন!

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

সুন্দরী রুপিনে

ঝুমা মুখার্জি

~ রুপিন পাস ট্রেক রুট ম্যাপ ~ রুপিন পাস ট্রেকের আরও ছবি ~

২০১৩-র জুনে প্রকৃতির রোষে গাড়োয়াল যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল তারপর আমাদের মত অনেক পাহাড়প্রেমী ওপথে যাওয়ার সাহস দেখায়নি। অধিকাংশ রাস্তাঘাট বন্ধ, গ্রামের পর গ্রাম নিশ্চিহ্ন। তবে এই পবিত্র পুণ্যভূমি থেকে বেশিদিন নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখাও কষ্টকর,পুজোর ছুটিতে তাই বেরিয়ে পরলাম। এবার ট্রেক রুটটা একটু আলাদা। প্রবেশ যে পথে প্রস্থান অন্য পথে। আমাদের ট্রেক শুরু উত্তরাঞ্চল থেকে। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে যাব হিমাচল। গাড়োয়াল ঘোরা প্রায় অসম্ভব বলে হিমাচলের কিন্নর সার্কিট ঘোরার পরিকল্পনা মাথায় এল। কিন্তু সেটাও অভিনব, অ্যাডভেঞ্চারাস হওয়া চাই। সেইজন্য রুপিন পাস ট্রেকিংয়ের হোমওয়ার্ক শুরু। কুড়ি-পঁচিশজনের বড় একটা দল। সঙ্গে আমাদের দশ বছরের মেয়ে টুপুরও যাবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা অপরিচিত সকলে আটদিন একসঙ্গে কাটানো - এও এক নতুন অভিজ্ঞতা।
দেরাদুন স্টেশনে বাকি সদস্যেরা অপেক্ষায় ছিলেন। এখান থেকেই রওনা হব ধৌলার দিকে। অনেক অচেনা মুখের মধ্যে একটা মুখ খুব চেনা লাগল। হাসিমুখে এগিয়ে এসে হাত বাড়ায়। আরে এ তো সেই চমন, হর কি দুন ট্রেকে আমাদের গাইড ছিল। সেদিনের কলেজ পড়ুয়া চমন আজ অনেক পরিণত। সাতটার মধ্যেই গাড়ি ছেড়ে দিল। সকাল থেকেই মেঘে ঢাকা আকাশ,আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে বৃষ্টি হবেই। কিছুক্ষণের মধ্যেই নামল । ভিজে মাটির গন্ধ ভুলিয়ে দেয় জানলার কাচ তোলার কথা। ধৌলার দূরত্ব আড়াইশো কিমির মত। সন্ধের আগে পৌঁছব বলে মনে হচ্ছে না। বিশেষ তাড়াও নেই। প্রকৃতি, পথচলতি মানুষ দেখে আর নতুন সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলে বেশ সময় কাটছিল। এর মাঝে পুরলাতে এক ঘন্টার লাঞ্চ ব্রেক তারপর আবার চলা। নেটওয়ারে এসে থামতে হয় মিনিট দশেকের জন্য, এখান থেকেই শুরু গোবিন্দ ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারি,তাই প্রবেশের অনুমতি সংগ্রহ করতে হয়। এখানেই সাঁকরির রাস্তা পৃথক হয়ে যাচ্ছে, যেখান থেকে হর কি দুন ট্রেক শুরু। গাড়ি এসে থামল ছটা নাগাদ। ঘন জঙ্গলের মাঝে,আমাদের আজকের ক্যাম্পসাইট। সামনেই রুপিন নদী বয়ে চলেছে, ঘন অন্ধকারে এর থেকে বেশি দেখা গেল না। অপেক্ষা সকালের।

সেবা গ্রাম

সঙ্গীদের সোরগোলে ঘুম ভাঙল। আকাশ পরিস্কার,হাল্কা ঠান্ডা। ধৌলার সকাল বেশ মনোরম। আজকের পথ দীর্ঘ, তবে কঠিন নয়। বরফমোড়া শৃঙ্গ, অসংখ্য ছোট-বড় ঝরনার দেখা পাওয়া যাচ্ছে, তাছাড়া রুপিন নদী তো সর্বক্ষণের সঙ্গী। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে ঝরনার পাশে বসে দু'দন্ড জিরিয়ে নিয়ে আবার চলা। নানা রঙের বাহারও তাক লাগায়। পাহাড়ের ঢালে লাল রামদানার ক্ষেত তাকিয়ে দেখার মত। গৃহস্থের বাড়ির জানলায় উদাসী যুবতীর মুখ বা পাহাড়ি শিশুর হাসি, কখনও এক ঝাঁক ঈগল ক্যামেরার লেন্সে ধরা দেয়। বৈচিত্র্যের কোনও অভাব নেই। দুপুর নাগাদ সেবা গ্রামে পৌঁছে গেলাম, সবুজে ঘেরা সুন্দর গ্রামটি, মুখ্য আকর্ষণ কেন্দ্রে ঘড়ির আকৃতির এক প্রাচীন মন্দির। তবে দরজা বন্ধ, মন্দিরের দরজা তিন-চার বছরে একবার খোলে ও পুজো হয়। তাছাড়া কোনও কিছু উৎসর্গ করার ইচ্ছা থাকলে পাথরের দেওয়ালে আটকে দেওয়া যায়। এভাবে অনেক মেডেল, শিল্ড, কয়েন আটকানো আছে। আমরাও একটি কয়েন আটকে প্রণাম করে এগোলাম। গ্রামের কোনও বাড়িতে অতিথি হয়ে এখানেও থাকা যায়।
গ্রাম ছাড়িয়ে ফুলের বাগান, রকমারি ফলের বাগান পেরিয়ে নদীর গা ঘেঁসে দেড় কিমি রাস্তা আরও হেঁটে একটা কাঠের সেতু পার করে আজকের গন্তব্য। একদল ভেড়া আর ছাগল আমাদের পথ আটকেছে অস্থায়ী এক কাঠের সেতুর ওপর, যা উত্তরাঞ্চল ও হিমাচলকে পৃথক করেছে। ১৬ কিমি রাস্তা প্রথম দিনের পক্ষে যথেষ্ট। রঙের বাহার, পাখির কাকলি, নদী-ঝরনা, ছবির মত গ্রাম, হিমাচলি শিল্পশৈলী শহুরে মানুষকে আমূল পাল্টে দেয়। কোথা দিয়ে সময় চলে যায় হাঁটতে হাঁটতে। মনের আনন্দে এগিয়ে যাই আর ছবি তোলা চলে ফাঁকে ফাঁকে। সেটাই বিশ্রাম। অবশেষে আজকের গন্তব্যে - নদীর তীরে হলদি খাদ। সরবতের গ্লাস নিয়ে বসে পড়লাম। আড্ডা-গল্পে কেটে গেল সময়।

ঝাকার পথে

নিজেরা ট্রেক করা আর কোনও বড় দলের সঙ্গে ট্রেকিং-এর তফাত এবার বুঝলাম। এখানে প্রতিযোগিতা সঙ্গীদের সঙ্গে নয়, শুধুই নিজের সঙ্গে প্রকৃতির। টিমের গাইডের লক্ষ্য সকলকে নিরাপদে গন্তব্যে নিয়ে যাওয়া। তাই প্রথম দিনেই তাকে বুঝতে হয় ট্রেকারদের গতি। দলে বিভিন্ন বয়সী ট্রেকার যেমন রয়েছে তেমনি ফিটনেস সকলের সমান নয়। তাই কয়েকটি দলে ভাগ করা হয়। যাদের গতি ধীর বা বয়স্ক তারা যাবে সবার আগে। শুরুতেই সাঙ্ঘাতিক চড়াই ও বোল্ডার ওয়াক বেশ খানিকটা। বেশ কঠিন। সাবধানে পথটুকু পার হলাম। আসলে আমাদের ক্যাম্প নদীর তীরে ছিল তাই বেশ অনেকটা উঠতে হল। এরপর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সহজ পথ। ছোট ছোট ঝরনা ডিঙিয়ে, পাতার স্পর্শ গায়ে মেখে, পাখিদের ডাক শুনে একসময় জঙ্গল শেষ। এবার সহজ গাড়ির রাস্তা শুরু। বেশ মজার, প্রথমে কঠিন পথ পার হয়ে তারপর সরল পথ। শুরুতেই যা পরীক্ষা। পর পর হিমাচলি গ্রাম পেরিয়ে যেতে হবে। গোসাংগু প্রথম গ্রাম। এখনই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে সামনে এগিয়ে যাব না এখানেই ট্রেক শেষ। এখান থেকেই দায়িত্ব সহকারে রোহরু পৌঁছে দেবে। সিমলা যাওয়ার গাড়ি ওখান থেকেই পাওয়া যাবে। উৎসাহী ট্রেকারদের সকলেই যে রাস্তা কিওয়ারি গ্রাম যাচ্ছে সেদিকেই পা বাড়াল। ধীরে ধীরে প্রকৃতির রূপ বিস্মৃত,মোহিত করছে। ডানদিকে বহমান সুন্দরী রুপিনে মিশছে চঞ্চলা ঝরনা। খানিক বিশ্রাম, ছবি তোলা, পিছিয়ে পড়া সঙ্গীর অপেক্ষায় একটু থামা, গলা ভিজিয়ে আবার চলা। জিসকুন গ্রামে চা পানের বিরতি। এখানে ছোট বাজার আছে, প্রয়োজনীয় প্রায় সবই পাওয়া যায়। কেনাকাটার পাট চুকিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে খানিক সময় কাটালাম। সবাই অবাক

খুদে ট্রেকারকে দেখে। একজন প্রবীন বলেই ফেলেন, এত অল্পবয়সীকে রুপিনে নিয়ে কেউ যায় না, আমরা যেন রেখে যাই ওনার কাছে। কিন্তু মেয়ে তো হার মানার পাত্রী নয়, হাসিমুখে নিজের স্যাক নিয়ে এগোল। গ্রামের পথ ছেড়ে আবার পাথুরে পথ, তবে সর্বক্ষণ রুপিন ও তার শাখানদীগুলো সঙ্গী, জলের অভাব নেই। নদীর ধারে বসেই লাঞ্চ সেরে নিলাম। দুপুর প্রায় দেড়টা, খাবার পেটে পড়তেই দু চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। কিন্তু পথ যে আরও বাকি। আবার চড়াই শুরু। কিছুদূর যাওয়ার পর আবার জঙ্গল - পাইন, ফার, আখরোট গাছ ছাড়া আরও নানা গাছ-গাছালিতে ঘেরা। এদিকে আমার কন্যা মাটি থেকে আখরোট কুড়িয়ে বেজায় খুশি। আনন্দে তার হাঁটার গতি আরও বেড়ে গেল। জঙ্গলে গ্রামের মেয়েরা কাঠসংগ্রহে ব্যস্ত। শীত যে আসন্ন। তাদেরই একজনকে জিজ্ঞাসা করি ঝাকা গ্রাম আর কত দূর? জানা গেল প্রায় এসে গেছি। এক কিশোর দায়িত্ব নিল পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার। দলের বেশিরভাগজন পেছনে। দুপুর আড়াইটে নাগাদ গন্তব্যে হাজির। আজ গ্রামের বাড়িতেই অতিথি হিসেবে থাকা। গৃহকর্তা প্রত্যেককে একটি করে আপেল দিয়ে স্বাগত জানালেন। ঝাকা-ই এ পথের শেষ গ্রাম। সন্ধেতে আজ আর সঙ্গীদের সঙ্গে নয়, এ বাড়ির সদস্যদের সঙ্গে গল্পে দারুণ সময় কাটল। শহুরে আড্ডার থেকে আলাদা, চিন্তাভাবনা জীবনযাত্রা ভিন্ন। কষ্টকর কিন্তু সুখী জীবন। গৃহকর্তার সঙ্গে কথা বলে জানলাম হিমাচলের প্রত্যন্ত গ্রামে থেকেও এরা কোনও অংশে পিছিয়ে নেই। ছেলে বিদেশে কর্মরত আর মেয়ে সিমলায় ডাক্তারি পড়ছেন। কিন্তু নিজেরা অতি সাধারণভাবেই থাকেন।

জঙ্গলের পথে হেঁটে চলা

রিভার ক্রসিং

সরযুবাস থ্যাচ /বুরাস কান্ডি

ঝাকা ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না। কিন্তু সামনে আরও অনেক কিছু অপেক্ষায় আছে। আবার পথ চলা শুরু হল। প্রথমে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটা। রাস্তা বেশ ভালোই। মেঠো পথে হাঁটতে হাঁটতে একঝাঁক রুপোলি চড়াই শ্রেণির পাখি নজরে এল। কাছাকাছি যাওয়ার আগেই উড়ে গেল। অসাধারণ সে দৃশ্য, রূপালি ডানায় আলোর ঝকমকানি দেখার মত। এ পথে সারাক্ষণ পাখির ডাক শোনা যায়, তবে দেখা পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। বেশ নিশ্চিন্তে হাঁটছিলাম, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পর আবার বিপজ্জনক রাস্তা -মানে রাস্তা শেষ, এবার নিজেকে রাস্তা বানিয়ে হাঁটতে হবে। ইতিমধ্যে গাইড হাঁটার কৌশল সবাইকে যথাযথভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রথম দুদিনের পরীক্ষায় সবাই সফল। আজ থেকে পথ ক্রমশ আরও কঠিন হবে। খরস্রোতা নদীর গা দিয়ে জঙ্গলের রাস্তা শেষে ভি শেপের রিভার বেড ধরে পাথরের খাঁজে খাঁজে পা রেখে ব্যালেন্স করে এগোনো। প্রতিটি পদক্ষেপ সন্তর্পণে ফেলে নিজের ওয়াকিং পোল রাখার জায়গা ঠিক করে নিতে হবে। সাধারণত ডানহাতে পোল রাখা হয়, কিন্তু এখন বাঁদিকে নিতে হবে। ধীরে ধীরে বোল্ডারের ওপর দিয়ে এগোলাম। পাইন, ফার, ম্যাপেল পিছনে ফেলে এসেছি। এখন মাঝে মাঝে গুরাসের ঝোপ ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বোল্ডার ওয়াকিং বেশ কষ্টকর, বিপজ্জনকও। বেশ কিছুক্ষণ পর বুগিয়ালের দেখা পাওয়া গেল। এবারে লাঞ্চ, একটু বিশ্রাম তারপর আরও দুই কিমি হাঁটা। তবে এখানেও ক্যাম্প করা যায়, আদর্শ জায়গা তার জন্য, কিন্তু আমরা কাল রেস্ট ডে রেখেছি তাই এগিয়ে যাব খানিকটা। এ জায়গার নাম বুরাস্কান্ডি। ধীরে ধীরে গাছপালা কমে যাচ্ছে, ভুর্জগাছ আর কিছু গুরাস ছাড়া আর কোন গাছপালা নেই। সবুজ হারিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। তিনটে নাগাদ আজকের ক্যাম্পসাইটে পৌঁছে শরীরে নেমে এল রাজ্যের ক্লান্তি। ম্যাগি আর চা খেয়ে অবসাদ দূর করে অ্যাক্লেমেটাইজেসনের জন্য দু কিমি চড়াই ভেঙে ওপরে যেতে হল। ফিরে এসে নদীতীরে বসে সূর্যাস্তের শোভা দেখে ঠান্ডার প্রকোপে আর বাইরে থাকা গেল না। আজকের রাস্তায় নদীর রূপ মুগ্ধ করেছে। পাহাড়ি নদী কখন খরস্রোতা কখন শান্ত, কোথাও দুধ সাদা তো কোথাও তুঁতে নীল। সেসব ছবি দেখে পথের বর্ণনা লিখতে লিখতে ডিনার এসে গেল।

ধন্দেরাস থ্যাচ /লোয়ার ওয়াটার ফল ক্যাম্প

গরম জল, চা, জ্যাকেট, দুটো গ্লাভস্, উলেন মোজা, টুপি কোনও কিছুই ঠান্ডা কমাতে পারছে না। মেয়ের কান্নাকাটি শুরু - প্রচন্ড ঠান্ডায় হাতের আঙুলে ভীষণ যন্ত্রণা শুরু হয়েছে ,আগুনে হাত গরম করে গ্লাভস পড়ালাম, তবু ও যেতে চাইছে না আর। ওদিকে ইউ শেপের ভ্যালি আর রুপিন নদীর উৎস ওয়াটারফলস একদম হাতের ও চোখের নাগালে, এসব ছেড়ে ফিরে যাওয়ার যে আর উপায় নেই। প্রতিবার হিমালয়ে দুর্গম স্থানে এলেই একটা দ্বন্দ্বে পড়ে যাই - একদিকে হিমালয়ের অমোঘ টান আর অন্যদিকে মেয়ে। ভীষণ ঠান্ডা আর হাওয়ার দাপট, একটু রোদের দেখা নেই। আজকে খুব সামান্যই হাঁটা। তাই একটু রোদ্দুরের অপেক্ষায়। মেয়ে শান্ত হতেই যাত্রা শুরু করলাম। আজকের গন্তব্য নাগালের মধ্যেই, ছুঁয়ে ফেলার অপেক্ষায়। সবুজের চিহ্ন নেই রুক্ষ পাহাড়ে, বায়ুর ক্ষয়কার্যের নিদর্শন পথ জুড়ে। সঙ্গী হয়েছে এক পাহাড়ি কুকুর। আজ পুরোটাই বোল্ডার ওয়াক, কখন যেন দূর থেকে দেখা স্নোব্রিজে পৌঁছে গেলাম। সেখানে যাওয়ার সাহস দেখাইনি, অন্য পথ ধরলাম। হাঁটার ক্লান্তি বা ধকল আজ বেশ কম। সবাই নিজেদের ছন্দে চলেছে। আমাদের সঙ্গে দু তিনজন যারা ছিল তারাও হঠাৎ হারিয়ে গেল। মনে হল সবাই পৌঁছে গেছে আজকের গন্তব্যে, দ্রুত পা চালালাম। আজ আর কোন বিরতি নেই সোজা ক্যাম্পসাইট।

কালকের পাথুরে রুক্ষ অঞ্চল থেকে আজকের ক্যাম্পসাইটে এসে বেজায় খুশি আমি। অসাধারণ এ জায়গা। সবুজ তৃণভূমি, সামনেই অসংখ্য ঝরনার ধারা নেমে এসে রুপিন নদীতে মিশেছে। কাল থেকে প্রতীক্ষায় ছিলাম কখন এই রুপিন ভ্যালিতে পা রাখব। টিমের বাকি কেউই পৌঁছাননি, আমরা তিনজন প্রথম স্বর্গোদ্যানে পা রাখলাম। ঝাকায় দু'জন ট্রেকারের সঙ্গে আলাপ হয়, গতকাল তারা একদিনেই এখানে এসেছিল। সঠিক অ্যাক্লেমাটাইজেশন না হওয়ায় তাদের একজন ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গাইডের নির্দেশে ফিরেও যাচ্ছেন তাঁরা। খারাপ লাগল শুনে। আসলে পাহাড়ে এসে তাড়াহুড়ো নয় একদম,যেখানে যতটা সময় তা দিতেই হবে। পথশ্রমের ধকল কম তাই আজ সবাই বেশ চনমনে, দুপুরে জমিয়ে খিচুড়ি, পাঁপড়, আচার খাওয়া আর আড্ডা। তারপর একটু হাঁটাহাঁটি, এরই মধ্যে আগামী কালের কর্মসূচি জানিয়ে দেওয়া হল। আগামী

দুদিন বেশ কঠিন, আর যথেষ্ট ঝুঁকি রয়েছে। এই উচ্চতায় আবহাওয়ার কোনও ভরসা নেই, সকাল থেকে দুপুর অব্দি বেশ রোদ ঝলমলে, ধীরে ধীরে মেঘেদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। যখন তখন তুষারপাত শুরু হতে পারে। বিকেল থেকে ঝোড়ো হাওয়া সঙ্গে তুষারপাত শুরু হল। টেন্টে ঢুকে ঘুমিয়ে পড়েছি কখন বুঝতে পারিনি। রাজু ভাইয়ার ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙল, ডিনার নিয়ে হাজির। তখনও তুষারপাত হয়ে চলেছে, কিন্তু খাবার, গরম জলের জোগান কোনও কিছুর ত্রুটি নেই। কালকের চিন্তায় বাকি রাত প্রায় জেগে।

সেরা ক্যাম্পসাইট - লোয়ার ওয়াটার ফল ক্যাম্প

রতি ফেরি/ আপার ওয়াটার ফল ক্যাম্প

আজ বেশ গুরুত্বপুর্ণ দিন। শুরু থেকেই বেশ কঠিন। দূর থেকে দেখা আর নয় এবার ওই জলপ্রপাত পার হতে হবে। জল বেড়ে গেলে তখন আমাদের যাত্রা স্থগিত। তাই আজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা হতে হবে। ব্রেকফাস্ট রাস্তায়। আলোআঁধারিতে মোহময়ী রুপিন ভ্যালিকে গুডবাই, সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। নিজেদের ছোট স্যাক নিয়ে দুজন গাইড ভাইয়ের সঙ্গে টিমের সবাই হাঁটা দিল। দলের বাকি সদস্যরা, কুক পোর্টাররা আসছে পরে। ঘোড়াদের কাজ শেষ তাই মালবহনের দায়িত্ব পুরোটাই পোর্টারদের। এদের সঙ্গে নিজেদের কিছুতেই তুলনা করতে পারি না। যেমন এদের গতি তেমনি ক্ষমতা। পাহাড়ি এই মানুষগুলো সৎ, পরিশ্রমী আর সরল। এদের সাহায্য ছাড়া আমাদের ইচ্ছা অধরাই থাকত। ঘাসে মোড়া ক্যাম্পসাইট ছাড়তেই হল, শুরু হল কঠিন চড়াই। পাথরে পা রেখে ক্লাইম্বিং, বেশির ভাগ পাথরই যেখানে নড়ছে। সাবধানে পা ফেলে ওঠা বেশ কঠিন। নীচের দিকে তাকিয়ে উঠে যাচ্ছি, ওপরে তাকাতে বেশ ভয় করছে। হাঁপিয়ে পড়ছি, মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছে। সামনে পাহাড়ের গা বেয়ে জলধারা নেমে আসছে এটা পেরিয়ে ওপরে উঠে যেতে হবে,ভীষণ পিচ্ছিল পাথর, গাইড ভাইয়ার হাত ধরে একে একে পার হলাম। তারপর ভয় কাটল। এদিকে দলের দু'একজন অসুস্থ বোধ করছে, সবাইকে জলপানের নির্দেশ দিলেন গাইড, সঙ্গে শুকনো খাবার খাওয়া হল।

আজকের দিনটা কেটে গেলেই নাকি সব চিন্তার অবসান। এখানেই শেষ নয় এখন পেরোতে হবে খরস্রোতা নদী,জলপ্রপাত পরপর। বিপদ পদে পদে। যে ওয়াটারফলস দেখে দুদিন কেটেছে আজ তারই সামনে দাঁড়িয়ে, বিশ্বাসই হচ্ছে না। যেমন অপরূপ সুন্দরী, তেমনি ভয়ঙ্কর। কালো পাথরে ধাক্কা খেয়ে ধাপে ধাপে নেমে আসছে দুধ সাদা জলের ধারা, সৃষ্টি করেছে সুন্দরী রুপিন। সূর্যের আলো জলে পড়ে চোখ ঝলসে যায়, বিভিন্ন কোণ থেকে ক্যামেরাবন্দী করলাম এই অসাধারণ দৃশ্য। ক'দিন পরই থমকে যাবে এর গতি, প্রবহমান জলধারা জমে বরফ হয়ে যাবে। গাইডের নির্দেশে পার হলাম বহমান জলধারা,আবার এক অভিজ্ঞতা। একজন বরফ-ঠান্ডা জলস্রোতে ভেসে যাচ্ছিলেন, গাইড ভাইয়ার তৎপরতায় রক্ষা পেলেন। এই জলপ্রপাত দেখে আর আশ মেটে না। কেটে যায় সময়, তবু যেতে ইচ্ছা করে না এখান থেকে। আবার দুরূহ চড়াই আর দুর্গম পথ চলা শুরু। রুক্ষ ধুসর পাহাড়ে সাদা চকের যে দাগ দেখা যাচ্ছে, আসলে তা ছোট-বড় গ্লেসিয়ার। আজ যেন হাঁটছি কম,দাঁড়াচ্ছি বেশি। কখনও তা ক্লান্তিতে কখনওবা প্রকৃতির অচেনা রূপ দেখার অছিলায়। আজ পুরো পথই চড়াই এবং বেশ কঠিন। বাইশ জন ট্রেকার ছাড়াও সঙ্গে রয়েছেন গোটা দশেক পোর্টার - তাই বেশ বড় দল। পিছিয়ে পড়লেও ভয় নেই, সঙ্গে কেউ না কেউ আছেন সর্বক্ষণ। তবে আবহাওয়া খারাপের দিকে, ঠান্ডা হাওয়া চলছে। পা চালাতে হবে। খিদে তেষ্টা সবই ভুলতে বসেছি। তবে আমাদের রাজু ভাইয়া যখন রুটি সবজি হাতে দিল তখন কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব বুঝতে পারছিলাম না। মনে হল এত সুস্বাদু খাবার জীবনে যেন প্রথমবার খেলাম। প্রায় এসেই গেছি তাই একটু বসা যেতেই পারে। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, ঠান্ডা হাওয়ায় শরীর অবশ হয়ে আসছে। ঘণ্টা খানেক হাঁটার পর আজকের ক্যাম্পসাইটে পৌঁছে গেলাম। সবাই মিলে টেন্ট লাগানোর কাজে হাত লাগানো হল। গতকালের ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড যতটা সুন্দর ছিল আজ ঠিক উল্টো। পাথুরে এবড়ো খেবড়ো রুক্ষ একটা জায়গা আশেপাশে জলের কোন উৎস নেই। কেউ কেউ বেরোলো জল আর কাঠের সন্ধানে। আমি এতটাই ক্লান্ত যে শুয়েই পড়লাম, যদিও কাজটা ঠিক নয়। এদিকে দু'একজন অসুস্থ হয়েও পড়েছে। মেয়ে নিয়ে একটু ভয় তো করছেই, প্রায় চার হাজার মিটারের বেশি উচ্চতায় অবস্থান করছি। তবে আজ ওকে বেশ আত্মবিশ্বাসী লাগছে। সন্ধে থেকে আজও তুষারপাত হল। এই উচ্চতায় ঘুম প্রায় হয় না। মাঝরাতে বাইরে এসে দেখি চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে প্রান্তর, আকাশে হাজার বাতি জ্বলে উঠেছে। খোলা আকাশের নীচে পাঁচ মিনিট কাটিয়ে ঢুকে পড়লাম টেন্টে। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের পাঁচ ডিগ্রি কম টেন্টের ভেতরেও।

রুপিন ওয়াটার ফল

রতি ফেরি/ আপার ওয়াটার ফল ক্যাম্প

এপাড়ে নালাটি পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া এক নদীর আকার নিয়েছে। আর সেই পাথরের ওপর বেশ কয়েকজন নেমে শিবের নামগান করছে আর দুহাত তুলে নাচছে। কিছুটা এগিয়ে যেতেই পৌঁছে গেলাম ধঞ্চো গ্রামে। এখানে কিছু জনবসতি আছে। তবে এই মেলার সময় লঙ্গরখানা আর গ্রামের ঘরবাড়ি আলাদা করে চেনার উপায় নেই। যাত্রাপথে ধঞ্চোই প্রথম বিশ্রামস্থান। অনেকেই এখানে রাতে থেকে পরদিন আবার যাত্রা শুরু করেন। তাই রাত কাটানোর জন্য অনেক টেন্ট রয়েছে। তার অনেকগুলি একেবারে ধঞ্চো নালার পাশেই। তৈরি হয়েছে অনেক অস্থায়ী পাবলিক টয়লেট। ঘড়ির কাঁটায় তখন দুপুর দেড়টা। একটা লঙ্গরখানা থেকে রাজমার ডাল, ভাত আর সুন্দর গন্ধযুক্ত এক তরকারি দিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম। আমার পাশে দাঁড়িয়ে হর-পার্বতী সেজে বহুরূপী দুটি শিশুও চেটেপুটে ডালভাত খেয়ে নিল। ওরা স্থানীয় গাদ্দি অধিবাসী, বছরের এই ক'টা দিন খাওয়ার জন্য চিন্তা করতে হয় না, অন্য সময় ভেড়ার পাল চড়িয়েই দিন কাটে। দুর্গম অঞ্চল হওয়ায় খাবার সব সময় পৌঁছায় না। আর শীতে তো পুরোটাই বরফে ঢেকে যায়। লঙ্গরখানাটি স্থানীয় কাংড়া উপত্যকার একটি ক্লাবের। ওদের কাছেই জানতে পারলাম, ধঞ্চো আসলে ভগবান বিষ্ণুর বাগানবাড়ি। কেউ কেউ একে 'বৈকুণ্ঠধাম'ও বলে। শীতের ছ'মাস শিব ঠাকুর মণিমহেশের বাসস্থান ছেড়ে সমতলে চলে যান। তখন তিনি এই পার্বত্য অঞ্চল দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে যান ভগবান শ্রীবিষ্ণুর হাতে। হাতে সময় কম, তাই খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে পাহাড়ি পথ ধরে এগিয়ে চললাম।

যত ওপরের দিকে উঠছি প্রকৃতি যেন অনেক বেশি সুন্দর হয়ে উঠছে। ধঞ্চো নালা পাথরের ওপরে আরও খরস্রোতা আর ধবধবে সাদা জলের ধারায় পরিণত হচ্ছে। চারদিক খোলা একটি পাহাড়ের ওপর এসে নির্বাক হয়ে সামনে চেয়ে রইলাম। সামনের পাহাড়ের ওপর থেকে অনেকগুলো

ছোট ছোট ধাপে ধঞ্চো নালা নেমে এসেছে সমতলে। প্রত্যেকটি ধাপই এক একটা ছোট জলপ্রপাত। ধঞ্চোর লঙ্গরখানাতেই শুনেছিলাম পুরাণ অনুসারে শিব একবার ভস্মাসুরের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে এক প্রাণঘাতী বর দিয়ে ফেলেন, সে যার মাথাই স্পর্শ করবে সে মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কিন্তু চতুর ভস্মাসুর প্রথমেই তা স্বয়ং শিবের ওপর প্রয়োগ করতে উদ্যত হয়। বিপদ বুঝে শিব ঠাকুর পালিয়ে ধঞ্চোর এই জলপ্রপাতের আড়ালে থাকা এক গুহায় আশ্রয় নিয়ে ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু মোহিনীর রূপ ধরে নর্তকী রূপে ভস্মাসুরের সামনে আবির্ভূত হয়ে নাচের ভঙ্গীমায় ভস্মাসুরকে নিজের হাত নিজের মাথায় রাখতে বাধ্য করেন। সঙ্গে সঙ্গে ভস্মাসুর নিজেই ভস্মে পরিণত হয়।
জলপ্রপাতের দুপাশ দিয়ে দুটো রাস্তা সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে চলেছে মণিমহেশের দিকে। বাঁদিকের পাহাড়ি ঢাল বেয়ে যে পথে যেতে হবে, সে পথ সর্পিল রেখা হয়ে ওপরে উঠে গেছে, আর সেই পায়ে চলা পথের দুপাশে হলুদ ডেইজি ফুলের চাদর বিছানো। ভগবান বিষ্ণু নিজে হাতেই যেন তার প্রিয় বাগানবাড়িটি সাজিয়ে রেখেছেন।

সামিট রুপিন পাস

বরফের পথ

এতদূর আসা, এত কষ্ট সফল হবে যদি আজ পাস পেরোতে পারি। গাইড ভাইয়া সকলকে আজকের রাস্তা সম্পর্কে কিছু তথ্য নিয়ম বলে দিলেন। আগেই বলেছি দলে নানা বয়সী ট্রেকার আছে,আমার মেয়ে সর্বকনিষ্ঠ, যে প্রথম এই পাস অতিক্রম করবে। আজ পথ আরও বিপদসঙ্কুল, নদী ঝরনা যা দেখার হয়ে গেছে, এই উচ্চতায় যা আছে সবই জমে বরফ। পাথরের খাঁজে খাঁজে বরফ জমে আছে, পা স্লিপ করছে। সতর্কতা নিয়ে মেয়ের সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছি। ত্রিভুজাকৃতি ভাসমান বরফের নীল জলে সাদা মুকুট পড়া পাহাড়ের প্রতিচ্ছবি দেখে পা থমকে গেল। একেই বলে গ্লেসিয়াল পুল। আজ যেন দলের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে কে প্রথম পাস অতিক্রম করবে। আমি এতে সামিল হতে পারলাম না। মেয়ের সঙ্গেই আছি। রুপিন পাসের নীচে দাঁড়িয়ে মনে হল ৭০-৭৫ ডিগ্রি খাড়া। নিচ থেকে ওপরে তাকিয়ে মনে হল পারব না এই ওয়ালে উঠতে, কিন্তু মনের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে এগোলাম, সঙ্গীসাথীরা বেশ খানিকটা উঠে গেছে। ওদের অনুসরণ করলাম। শেষ পরীক্ষায় হেরে গেলে চলবে না। ওপরে না তাকিয়ে পায়ের দিকে তাকিয়ে উঠতে শুরু করলাম। মাঝে মাঝে ওপর থেকে লুজ পাথর গড়িয়ে পড়ছে তাতে আঘাতের সম্ভবনা। যথেষ্ট ঝুঁকি এ পথের। নিজের থেকেও বেশি মেয়ের কথা ভাবছি। ঈশ্বরকে স্মরণ করে ধীরে ধীরে এগোচ্ছি। কানে আসছে উল্লাস ধ্বনি।
অবশেষে সফল হতে পারলাম। একে অপরকে অভিনন্দন জানাতে ব্যস্ত সবাই। আমার কাছে এখন অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। সামান্য উপকরণ সহ পুজো হল পাসে,যদিও কোনও মন্দির বা মূর্তি নেই। বরফাবৃত ধৌলাধার রেঞ্জ দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। সবাই বরফের ময়দানে বিজয় উৎসবে মেতেছেন,ফটোসেশন চলছে সঙ্গে। চার হাজার ছ'শ পঞ্চাশ ফুট উচ্চতায় আত্মবিশ্বাসী টিম একত্রে ঘন্টাখানেক সময় কাটিয়ে উতরাই পথ ধরল।
এ পথ বেশ মজার। বরফে ঢাকা। সবাই বরফের ঢালে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে এসে থামলাম অসাধারণ সুন্দর এক গ্লেসিয়াল পুলের সামনে। স্বচ্ছ জলে বরফ ঢাকা পাহাড়চূড়ার প্রতিবিম্ব ধরে রাখলাম ক্যামেরায়। আজ একবারও জ্যকেট খোলার কথা মনে হয়নি,সারাদিনই কনকনে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, আর চারদিক তো বরফে ঢাকা। ক্রমাগত পাথুরে মাটিতে হেঁটে ক্লান্ত। ঘন্টা খানেক হাঁটার পর সবুজের দেখা পেলাম,যেখানে আমাদের জন্য খাবার নিয়ে সদাহাস্যময় রাজু ভাইয়া অপেক্ষা করছেন। প্রকৃতির রূপ ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে, ধূসর প্রকৃতি নানা রঙের স্পর্শে বর্ণময় হয়ে উঠছে। কাল থেকে সবাই আবার নিজের নিজের কর্মজগতে ফিরে যাবে,আজও টিমের কয়েকজন সাংলায় নেমে যাবে। তাই প্রায় সবাই আজ এগিয়ে গেছে। আমাদের বিশেষ তাড়া নেই, পাহাড়, প্রকৃতির সান্নিধ্যে বড় ভাল লাগে, ধীরে ধীরে হেঁটেও চারটের মধ্যে আজকের গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম। আজ লোকজন অনেক কম, তাছাড়া সবাই বেশ ক্লান্ত তাই ক্যাম্প সাইট একদম শান্ত।

সাংলা পৌঁছানো

সাংলা ভ্যালি

শরতের ঝলমলে সোনালি সকাল। চা ম্যাগি খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম দেরি না করে। ৪১০০ মিটার উচ্চতা থেকে ৩৬০০ মিটার উচ্চতায় নেমে যাব। ১২ কিমি রাস্তা উতরাই হলেও হাঁটা মুখের কথা নয়। একটানা উতরাই পথে হাঁটা বেশ ক্লান্তিকরও। আজ কোনও বিরতি নেই, অনবরত চলা। সবুজ তৃণভূমি, ঘন পাইনের জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে দুপুর দুটোয় আপেলের দেশে পা রাখলাম। কিন্নরবাসীরা সোনালি আপেল হাতে স্বাগত জানায়। দূর থেকেই তুঁতে নীল বসপা নদী ও সাংলা শহর দেখা যাছে। কিন্তু এখনও দেড় কিমি যেতে হবে নানা রঙের, নানা স্বাদের আপেল বাগিচার মধ্যে দিয়ে। একদম অন্যরকম সুন্দর এই পথ, ক্লান্তি তেষ্টা সব ভুলিয়ে দেয়। বসপা নদীতীরে অবস্থিত ছোট শৈলশহর সাংলা-র প্রেমে পড়ে গেলাম। ভিড়-কোলাহল-ব্যস্ততা এখানে কম, ট্যুরিস্টদের নিয়ে কিন্নরবাসীদের তেমন মাথাব্যথাও নেই। এখন আপেলের সিজন, এরা তাই ভীষণ ব্যস্ত। আটদিন জনারণ্য থেকে দূরে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম থাকার পর তাই আমাদের এমন ঠিকানারই দরকার ছিল। মনের মত আশ্রয়ও পেয়ে গেলাম। এবার হিমাচলের কিন্নর সার্কিট ঘুরে দেখার পালা। সে গল্প আরেক দিন।

রুপিন পাস

~ রুপিন পাস ট্রেক রুট ম্যাপ ~ রুপিন পাস ট্রেকের আরও ছবি ~

নিজের সংসারকে সুন্দর করে রাখা ছাড়াও ঝুমা মুখার্জি ভালোবাসেন অনেককিছুই। তাঁর ভালোলাগা-ভালোবাসার তালিকায় বই পড়া, গান শোনা, নতুন নতুন রান্না করার পাশাপাশি রয়েছে ইন্টারনেট সার্ফ করে পাহাড়ের ছবি দেখা আর নানা ট্রেক কাহিনি পড়া। আসলে তাঁর কাছে সবার চেয়ে প্রিয় ট্রেকিং-ই। পাহাড়ের ডাকে বছরে অন্তত দুবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েনই। আর এই বেড়ানোয় তাঁর সঙ্গী প্রিয়জনদের তালিকায় রয়েছে ডায়েরি আর কলমও।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কেমন লাগল : - select - ▼

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

চন্ডীগড়ের কল্পনগরীতে

অতীন চক্রবর্তী

শীতের সকালের আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে ট্রেনটা এগিয়ে চলেছে চন্ডীগড়ের দিকে। আর ঘন্টাখানেক বাদেই পা রাখব পাঞ্জাব-হরিয়ানার রাজধানী চন্ডীগড়ে, যাকে বলা হয়- 'সিটি অফ বিউটিফুল'। শিবালিক পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছোট্ট সুন্দর একটি শহর। বেশিদিন হয়নি শহরটি গড়ে উঠেছে। ১৯৫০ সালে ইউরোপিয়ান স্থপতি ল্য করব্যুজে (Le Corbusier) আধুনিকতার ছোঁয়ায় এর ডিজাইন করেছিলেন। তবে শহরের নামের কোন পরিবর্তন হয়নি। শহরের কাছে পঞ্চকুলাতে রয়েছে দেবী চন্ডীর প্রাচীন একটি মন্দির, এছাড়া পুরানো একটি দুর্গ বা গড় আজও রয়েছে এই শহরের পাশে। এই দুই প্রধান দ্রষ্টব্যকে মিলিয়েই নাম হয়েছে চন্ডীগড়। ১১৪ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের ছোট্ট এই চন্ডীগড়ের আশপাশের শহরগুলির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস। প্রায় ৮০০০ বছর আগে এইসব জায়গা ছিল সিন্ধু সভ্যতার মানুষজনের বাসস্থান, যার নিদর্শন সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিদেরা উদ্ধার করতে আরম্ভ করেছেন। ফরমানা খাস দক্ষখেরা হচ্ছে হরিয়ানায় পাওয়া প্রথম নগর কেন্দ্রিক সভ্যতার নিদর্শন। এছাড়া বনোয়ালি, ভীরদোনা কুনালেও খনন করে সিন্ধু সভ্যতার নানান নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। এইসব সভ্যতার সঙ্গে মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার পরিকল্পনা ও গঠনকৌশলের মধ্যেও ঐক্য রয়েছে। হঠাৎ হইহট্টগোলে ভাবনার রেশটা কেটে গেল। মিনিট দশ আগে চন্ডীগড় পৌঁছেছি। ঠিক করেছিলাম কপিলদেবের 'ইলেভেনস - দ্য ক্যাপ্টেনস রিট্রিট' (Elevens - the Captains Retreat) -এ উঠব, কিন্তু দুটো ডবল বেড রুম না পেয়ে হোটেল 'পিকাডালি'তে উঠতে হল। কপিলদেবের গৌরবময় জীবনের বিভিন্ন সময়ের নানা ছবিতে দেওয়াল - সিঁড়িগুলো সুসজ্জিত করে রাখা আছে হোটেল ইলেভেনস-এ। দুপুরে হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম মোহালি ক্রিকেট স্টেডিয়াম দেখতে। পরের গন্তব্য চন্ডীগড়ের প্রাচীন মাতা চন্ডীদেবীর মন্দির। পর্যটক আর স্থানীয় ভক্তের সমাবেশে মুখর এই সুন্দর মন্দিরপ্রাঙ্গণ। দূরে শিবালিক পাহাড়ের অপূর্ব শোভা মন ভরিয়ে দেয়। ফেরার পথে পঞ্চকুলায় এশিয়ার বিখ্যাত ক্যাকটাস গার্ডেনে ঢুকে পড়লাম। সাত একর জমির ওপর প্রায় ৩৫০০ রকমের বিভিন্ন ধরনের ক্যাকটাস দিয়ে ১৯৮৭ সালে তৈরি এই গার্ডেনে রয়েছে তিনটি গ্রীন হাউস। প্রতিদিন দূর দূর থেকে অনেক পর্যটক এই আকর্ষণীয় গার্ডেনটি দেখতে আসেন। কেউ কেউ এখান থেকে পিনজোর যাদবিন্দ্র গার্ডেনটি দেখতে চলে যায়। মোগল স্টাইলের শিসমহল প্যালেস, রঙমহল বা জলমহল দেখতেও পর্যটকেরা এখানে আসেন।

কাল সকালে দেখতে যাব চন্ডীগড়ের পর্যটকদের প্রধান আকর্ষণ 'রক গার্ডেন', অনেকে যাকে বলে 'strange and whimsical fantasy'। রাতে সপরিবারে হোটেলে দেখা করতে এসেছিল মি. রাকেশ। গীত-গজল রচনা করে বেশ নাম করেছে আমার এই বন্ধু। 'থোড়ি থোড়ি পিয়া কর'- বিখ্যাত গজল গায়ক পঙ্কজ উদাসের কণ্ঠে ওর লেখা এই গানটি এক সময় শ্রোতাদের মন জয় করে নিয়েছিল। রাকেশের মুখেই সেদিন এই রক গার্ডেনের স্রষ্টা নেক চাঁদের কাহিনি শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। নানান প্রতিকূলতার মধ্যেও সুখনা লেকের কাছে জঙ্গলের আড়ালে গোপনে একক প্রচেষ্টায় তাঁর এই সৃষ্টির কাজ করে গিয়েছিলেন। এমনকী এ বিষয়ে কোনও প্রথাগত শিক্ষাও তাঁর ছিল না।

চাকরি করতেন চন্ডীগরের একজন সাধারণ সরকারি রোড ইন্সপেক্টরের। কাজের তাগিদে শিবালিক পাহাড়ের পাদদেশে প্রায়ই ছোটাছুটি করতে হত। তাঁর শিল্পী চোখ এই পাহাড়ের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পাথরের টুকরোগুলোর মধ্যে পাখি, নানা জন্তু-জানোয়ার বা নারী-পুরুষের বিভিন্ন ভঙ্গিমার সাদৃশ্যমান রূপ খুঁজে নিত। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এইভাবে সংগ্রহ করেছিলেন কুড়ি হাজারের মতো বিভিন্ন রূপাকৃতির পাথরের টুকরো। এছাড়া কাজের ফাঁকে ফাঁকে সময় বার করে কুড়িয়ে আনতেন ফেলে দেওয়া নানারকম শিশি-বোতল, গ্লাস, টাইলস, ভাঙা চুড়ির টুকরো, সিরামিক কাপ-ডিস-বাসন-পত্র-হাঁড়ি-কুড়ি বা ফেলে দেওয়া নানা ইলেকট্রনিক্স আইটেম, চামচ-ফর্কস, খেলার মার্বেল, গাড়ির নানা পার্টস ইত্যাদি। ক্রমে ক্রমে তাঁর এই সংগ্রহসামগ্রী এত বেশি হয়ে গিয়েছিল যে একটা স্টোররুমও বানাতে হয়েছিল।

রোজের কাজের শেষে জঙ্গলের মাঝে দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে মানুষের ফেলে দেওয়া এইসব জঞ্জাল থেকে তৈরি করতে থাকেন রক গার্ডেনটি। প্রায় বারো একর জঙ্গলময় জমিতে এইসব অবাঞ্ছিত জঞ্জাল দিয়েই রূপ দিয়েছেন গায়ক-নর্তকীদের, কংক্রিটের সঙ্গে জুড়ে তৈরি করেছেন হাঁড়ির দেওয়াল, জন্তু-জানোয়ারের বিচরণস্থল, রাজদালান, দরবার ইত্যাদি। এই বে-আইনি দখল জমিতে প্রায় আঠেরো বছর ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে গড়া পাথরের বাগানটি ১৯৭৫ সালে সরকারের নজরে আসে। সিদ্ধান্ত হয় ভেঙে দেওয়ার। কিন্তু সাধারণ মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে

পাশে দাঁড়ান এই শিল্পীর। বেঁচে যায় তাঁর এত দিনের সাধনা। বরং এবারে সরকারের তরফ থেকে সাব-ডিভিসানাল ইঞ্জিনিয়ার নেক চাঁদকে রক গার্ডেনটি নির্মাণের জন্য পুরো সময়ের জন্য বহাল করলেন। তাঁকে সাহায্য করার জন্য পঞ্চাশজন মজুরও নিযুক্ত করা হল। নেক চাঁদও বিপুল উদ্যম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন লক্ষ্যে।

১৯৭৬ সালে সাধারণের জন্য এই পার্ক উদ্বোধন করা হয়, তখন মাত্র ফেজ-১, ২ তৈরি হয়েছিল। পরে ১৯৯৩ সালে ফেজ-৩ র কাজ সম্পূর্ণ হয়। ১৯৮৩ সালে ওয়াটার ফলসটি চালু হয়। আজ এই গার্ডেনটি দাঁড়িয়ে আছে চল্লিশ একর জমির ওপর। ১৯৮০ সালে অপূর্ব শৈল্পিক দক্ষতার জন্য নেক চাঁদকে প্যারিস থেকে 'Grande Medaille de Vermeil' সম্মানে ভূষিত করা হয়। ১৯৮৪ সালে ভারত সরকারের তরফে পদ্মশ্রী সম্মানও দেওয়া হয়েছে।

রাকেশের কাছ থেকে বাগানটির ভেতরের বর্ণনা জানতে চাইলে ও একটা সুন্দর উপমা দিয়েছিল – গল্প বা মানুষের জীবন কাহিনি মুখে বর্ণনা করে প্রকাশ করা যায়। কিন্তু সৌন্দর্য উপলব্ধির বস্তু, চাক্ষুষ দেখে তাকে নিজের মনে ভরে নিতে হয়। যেমন ফুলের সৌরভ কারও মুখে শুনে আমরা অনুভব করতে পারি না। মোট কথা নিজের চোখে দেখে তবেই একে উপলব্ধি করতে পারব।

পরের দিন সকাল নটার আগেই পৌঁছে গেলাম। গেটের কাছেই টিকিট ঘর। বাইরে থেকে বাগানের চারপাশের উঁচু পাঁচিল দেখলে মনে হয় এ যেন কোনও রাজপ্রাসাদের রক্ষা প্রাচীর। ভাবতে অবাক লাগে, সুখনা লেকের পাশে এই জায়গাতেই একসময় চণ্ডীগড়ের সমস্ত নোংরা-আবর্জনা এনে ফেলা হোত। অনাদরণীয়-উপেক্ষিত সেই স্থানের চেহারাই আজ বদলে গেছে পুরোপুরি। আজ দেশ-বিদেশ থেকে কত সৌন্দর্য পিপাসু পর্যটক ছুটে আসছেন নেক চাঁদের শিল্পীমনের মাধুরী দিয়ে গড়া অসামান্য বিস্ময়কর সৃষ্টি দেখতে।

ইতিমধ্যেই দেশি-বিদেশি পর্যটকদের ভিড় বেশ জমে উঠেছে। ভেতরে ঢুকে কিছুটা এগিয়ে গেলে নীচের প্রাঙ্গণে যাওয়ার সিঁড়ি। বাগানে মোট চোদ্দটা নানা সাইজের চেম্বার রয়েছে। এক একটা চেম্বারে এক এক রকম সাজানো দৃশ্য দেখে অবাক হতে হয়! মিউজিসিয়ান চেম্বার অথবা রাজ দরবারে পাথরের বা সিরামিকের টুকরোগুলোকে নানাভাবে বসিয়ে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার দৃশ্যগুলো সবার নজর টানছিল। সিংহাসনের চারপাশে রয়েছে রাজদরবারের লোকেদের উপস্থিতি।

রক গার্ডেনের অন্যতম আকর্ষণ ঝরনাগুলির পাশের পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে চোখে পড়ে হাঁড়ি মাথায় সুসজ্জিতা কয়েকজন গ্রাম্য নারী জল ভরতে এগিয়ে চলেছে। পাহাড়ের ওপর থেকে জলপ্রপাতের ধারা বয়ে চলেছে নীচের দিকে। পুরো জায়গাটাই বেশ শীতল।

ওপেন এয়ার থিয়েটার, বিরাট একটি প্যাভিলিয়ন এইসবই পরে বানানো হয়েছে। এদেরই ভেতরই দেখলাম রক গার্ডেনের আর্ট এন্ড কালচার। ছাদের চারপাশটায় সারি দিয়ে ঘোড়ার মূর্তি রাখা হয়েছে।

দুপুর শেষ হতে চলেছে। গার্ডেন থেকে বেরিয়ে এসে মনে মনে কুর্ণিশ জানাই নেক চাঁদকে। ব্যর্থ হয়নি শিল্পীর সেই একক সাধনা। ভরা মন নিয়ে ফিরে চলি।

অবিভক্ত ভারতের রাজশাহী জেলার নওগাঁতে জন্ম অতীন চক্রবর্তীর। সরকারি পেশা এবং ভ্রমণের নেশার টানে ঘুরেছেন ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে। দীর্ঘদিনধরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিতভাবে গল্প ও ভ্রমণকাহিনি লিখছেন। সাহিত্যক্ষেত্রে পেয়েছেন একাধিক পুরস্কারও।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

দানিয়ুবে নৌকাবিহার

সৌমিত্র বিশ্বাস

~ ভিয়েনার আরও ছবি ~

জুন মাসে দিল্লির প্রচণ্ড দাবদাহে অবস্থা খুবই কাহিল, আর ঠিক তখনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচার মতো অস্ট্রিয়া যাওয়ার সুযোগটা এল বেশ হঠাৎই - এক বিশেষ কাজে যেতে হবে ভিয়েনার কাছে ব্যাডেন শহরে। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি বিমানবন্দর থেকে সোজা ভিয়েনা ইন্টারন্যাশনাল পৌঁছলাম এক রবিবারের ভোরে। গাড়ি চলল সুড অটোবান-এ-টু ধরে, অস্ট্রিয়ার গ্রামগঞ্জে সবে তখন সোনালি আলোর পরশ লেগেছে। বেশ তাড়াতাড়িই পৌঁছে গেলাম ছোট্ট শহরটিতে। অনতিদূরে সবুজ পাহাড়ের জটলা আর শহরের প্রবেশপথে আদিগন্ত আঙুর ক্ষেত - প্রথম দর্শনেই মনটা জয় করে নিল ছবির মত সুন্দর ব্যাডেন!

ছবির মত সাজানো ব্যাডেন শহরে

ভিয়েনা থেকে ২৬ কিমি দূরে উইনারওয়ালড্ পাহাড়সারির পাদদেশে ব্যাডেন। শহরের চারপাশে একশ কুড়িটি আঙুর বাগান। জার্মান ভাষায় ব্যাডেন অর্থ 'স্নান' - শহরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তেরোটি উষ্ণ প্রস্রবণ ও সামুদ্রিক স্নানঘর এই নামের উৎপত্তির কারণ। সেই রোমান যুগ থেকেই উষ্ণ প্রস্রবণগুলির জন্যে ইতিহাসে ব্যাডেনের পরিচিতি। অতীতে তুরস্ক ও হাঙ্গেরি অস্ট্রো-জার্মান সাম্রাজ্য ভুক্ত ব্যাডেন আক্রমণ করেছিল বারবার। পরবর্তীকালে ব্যাডেন হয়ে ওঠে অস্ট্রিয়ান রাজ পরিবারের অতি পছন্দের গ্রীষ্ম নিবাস। অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ লুডউইগ ভ্যান বিঠোফেন (১৭৭০-১৮২৭) ব্যাডেনে বেশ কিছু বছর কাটিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ১৯৫৫ সাল অবধি মিলিত শক্তির পক্ষে সোভিয়েত সেনাবাহিনী অস্ট্রিয়া শাসন করেছিল এই ব্যাডেন থেকে।

ব্যাডেনে আমাদের হোটেলটি ছিল আদতে একটি প্রাসাদ - অধুনা চারতারা বিশিষ্ট হোটেল, কিন্তু হোটেল কোম্পানির প্রাসাদটির ঐতিহ্য বজায়ের প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। পুরনো আমলের কাঠের সিঁড়ি, কাঠের মেঝে, আসবাবপত্র, ঝাড়বাতি, মর্মর মূর্তি - এসবই যত্নের সঙ্গে সংরক্ষিত। হোটেলটির বিশেষ আকর্ষণ স্পা আর সাওনা। দেখলাম অনেক পর্যটক এসেছেন অস্ট্রিয়ার ও জার্মানির কাছাকাছি ছোট শহর থেকে গাড়ি চালিয়ে, ব্যাডেনে সপ্তাহান্তের ছুটি কাটাতে। হোটেলের পাশেই ব্যাডেন মিউনিসিপ্যালিটির গোলাপ উদ্যান 'রোজারিয়াম' - বেশ কয়েক একর বিস্তৃত। নানা প্রজাতির নানান রঙের গোলাপ ছাড়াও বাগানটিতে সার সার বহু পুরনো মহীরুহ, শান্ত জলাশয়, তিন-চারটি রেস্তোরাঁ - সপ্তাহান্তে ব্যাডেনারদের অতি প্রিয় আউটিং স্থল।

পৌঁছেছি রবিবার সকালে, পরেরদিন আসল কাজ। তাই আর সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়লাম ভিয়েনার উদ্দেশ্যে। 'রোজারিয়াম'-এর মধ্য দিয়ে হাঁটাপথ, গোলাপ বাগানের শোভায় চোখ গেল জুড়িয়ে। ব্যাডেন শহরে রাস্তার দুপাশে ওপেন-এয়ার ক্যাফেটোরিয়া, থাই-চাইনিজ- জাপানি-ইতালিয় খাবারের রেস্তোরাঁ, সেরামিকস-এর পুতুল, নানারকম হস্তশিল্প ও চিজের দোকান, সুন্দর চ্যাপেল - এসব দেখতে দেখতে পৌঁছলাম ছোট্ট শহরটির ডাউন-টাউন অঞ্চলে। জায়গাটার নাম জোসেফসপ্লাৎজ, পরাক্রমী অস্ট্রিয়ান সম্রাট প্রথম কাইজার ফ্রান্জ জোসেফ (১৮৩০-১৯১৬)-এর নামে। অনেকটা জায়গা জুড়ে এক বিশাল চত্বর - কেন্দ্রে এক উষ্ণ প্রস্রবণ, কাছে গেলে নাকে আসে মৃদু গন্ধকের বাস।

জোসেফপ্লাৎজ থেকে ছাড়ছে ভিয়েনা যাওয়ার ট্রাম - ভিয়েনার স্টেট অপেরা পর্যন্ত প্রায় ৩০ কিমি দূরত্ব, সময় লাগে এক ঘণ্টা আর ভাড়া ৪.৫০ ইউরো। দুই কোচ বিশিষ্ট ট্রাম গাড়ি - বসে পড়লাম বড় বড় কাঁচের জানলার ধারের আসনে। ব্যাডেন শহর ছাড়াতেই অস্ট্রিয়ার গ্রামাঞ্চল ধীরে ধীরে মেলে ধরল তার অপরূপ চিত্রিত ক্যানভাস - নানা রঙের ফুলে সাজানো ছোট্ট বাড়ি, দূরে পাহাড় ছোঁয়া আঙুরের ক্ষেত, ট্রাম লাইনের পাশে বহতা ছোট নদী, অনেকটাই আমাদের সর্ষে ফুলের মত দেখতে উজ্জ্বল সোনালি বর্ণের রেপসিডের চাষ - একঘণ্টা যে কিভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারিনি! ট্রাম পৌঁছল ভিয়েনার উপকণ্ঠে, শহরে প্রবেশ করেই সেঁধোল মাটির তলায়।

ইন্টারনেটের সুবাদে জেনেছিলাম ভিয়েনার দানিয়ুবে নৌকাবিহারের কথা। দানিয়ুব সত্যিই এক মহানদী, ইউরোপের দশটি দেশ জুড়ে প্রবহমান।

দৈর্ঘ্যে ২৯০০ কিমি দানিয়ুবকে আন্তঃ-ইউরোপিয়ান জলপথ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তাই এ নদীপথে পণ্য আমদানি-রপ্তানি সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক। অস্ট্রিয়ার সীমারেখার মধ্যে প্রায় ৩০০ কিমি ধরে বয়ে চলেছে দানিয়ুব - নদীর দুধারে গড়ে উঠেছে ভিয়েনা শহর। রবিবার দুপুরে দানিয়ুবের বুকে নৌকাবিহার - এমন সুযোগ কি ছাড়া যায়? ট্রাম থেকে নামলাম কার্লসপ্লাৎজ-এ, সেখান থেকে পাতালরেল ধরে শ্বেডেনপ্লাৎজ। বড় রাস্তার ধারে দানিয়ুব ক্যানাল, জাহাজ-জেটি থেকে ক্রুজের রওয়ানা। ডিডিএসজি ব্লু দানিয়ুব নামের কোম্পানি চারটি দোতলা জাহাজ চালায় দানিয়ুব ক্রুজের জন্য, এছাড়াও তাদের নিয়মিত জাহাজ চলে ভিয়েনা থেকে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্ট ও স্লোভাকিয়ার রাজধানী ব্রাতিস্লাভা। আমরা চড়লাম এম-এস স্লোজেন জাহাজে - ওপর ও

গোলাপ বাগান রোজারিয়াম, ব্যাডেন

এম-এস স্লোজেনে চেপে দানিয়ুবে সফর

নীচ তলার দুটি ডেকে প্রায় দুশ তিরিশ জন যাত্রীর বসার ব্যবস্থা, সাড়ে তিন ঘণ্টার ক্রুজ ২১ ইউরোর বিনিময়ে। জাহাজ চলল দানিয়ুব ক্যানাল দিয়ে - দুপাশে গথিক শৈলীর অট্টালিকা, আধুনিক অফিস পাড়া, গগনচুম্বী আবাসন। শহর ছাড়িয়ে শহরতলি - সুন্দর সব ভিলা ও শ্যালে, টাউন হাউস, কাঠের তৈরি গ্রীষ্মনিবাস। এসব পেরিয়ে জাহাজ পৌঁছল দানিয়ুবের মূল স্রোতে। কিছু দূর গিয়েই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের এক ব্যারাজ - দুটি লকগেটের মধ্যবর্তী খালে এসে দাঁড়ালো আমাদের জাহাজ ও দু'টি নৌকা। পেছনের লকগেট বন্ধ করে খালে ধীরে ধীরে ছাড়া হল জল, দুপাশের জলস্তর এক হলে খুলে দেওয়া হল সামনের লকগেট - জাহাজ পেরিয়ে এল ব্যারাজ।

দানিয়ুবের শোভা দর্শনের মাঝে অনেক ট্যুরিস্ট চললেন এম-এস স্লোজেনের রেস্তোরাঁ অভিমুখে। রেস্তোরাঁর খাদ্য তালিকাটি দীর্ঘ না হলেও চটজলদি খিদে মেটাবার জন্য যথেষ্ট - সেমোলিনার স্যুপ, হ্যাম বা টার্কির স্যালাড আর মেন কোর্সে বারবিকউ করা টার্কির ফিলে দিয়ে ভাত বা আলুসেদ্ধর সঙ্গে ভাজা ট্রাউট মাছ কিংবা বিফ রোস্ট তারপর ডেসার্ট হিসেবে কেক, পেস্ট্রি...সঙ্গে পানীয় বিয়ার বা ফরাসি ওয়াইন!

হফবার্গ প্যালেস, ভিয়েনা

অস্ট্রিয়ায় তখন মনোরম গ্রীষ্ম, সপ্তাহান্তের ছুটিতে ভিয়েনাবাসী দানিয়ুবে জলক্রীড়ায় ব্যস্ত - চারদিকে স্পিডবোট ও জল-স্কুটারের ভিড়। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পর এম-এস স্লোজেন ভিড়ল জেটিতে, বিখ্যাত বিশালাকায় রাইখসব্রুক সেতুর কাছে। রাইখসব্রুক সেতুটি তৈরি হয় ১৮৭৬ সালে, পরে সেটির প্রভূত সংস্কার করা হয়েছিল ১৯৩৭ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চাদপসরণকারী নাৎসি সেনাদের বিধ্বংসী আক্রমণ থেকে দানিয়ুবের একমাত্র এই সেতুটিকেই বাঁচানো সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যজনক ভাবে সেতুটি ভেঙে পড়ে ১৯৭৬ সালে; ১৯৮০ সালে পুনর্নির্মিত হয় রাইখসব্রুক সেতু। ভিয়েনার কেন্দ্রস্থলে স্তিফানপ্লাৎজ থেকে দানিয়ুবের অপর পাড়ে ডোনাউস্টাড-এর সঙ্গে যোগাযোগকারী ব্যস্ততম এই ছয়-লেন বিশিষ্ট সেতু রোজ ৫০,০০০ যানবাহন ও মেট্রোরেলের ভার বহন করে। মিনিট দশেক বিরতির পর আবার চলল জাহাজ; দানিয়ুবের বুকে ২১ কিমি লম্বা এক কৃত্রিম দ্বীপের ধার ঘেঁষে। ডানদিকে রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন কার্যালয়, ২৫২ মিটার উঁচু দূরসঞ্চারের জন্য ব্যবহৃত 'দানিয়ুব টাওয়ার', বাঁদিকে ১৯৯৯ সালে আধুনিক শৈলীতে তৈরি ২৫০ মিটার উঁচু 'মিলেনিয়াম টাওয়ার', পশ্চিমপানে ঢলে যাওয়া সূর্যের আলোয় ভিয়েনার স্কাই-লাইন!

অবশেষে এম-এস স্লোজেন ফিরে এল যাত্রাশুরুর জেটিতে - একে একে তখন জ্বলে উঠছে রঙিন আলোর মালা, ভিয়েনা সাজছে এক রবিবারের সন্ধ্যাকে স্বাগত জানাতে। আমরা চললাম ব্যাডেনের পথে - সৃষ্টির আদিকাল থেকে বয়ে চলা, ইতিহাসের নীরব সাক্ষী মহানদী দানিয়ুবের কথা ভাবতে ভাবতে।

দানিয়ুবে স্পিডবোটে

~ ভিয়েনার আরও ছবি ~

সৌমিত্র বিশ্বাস পেশায় কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। অধুনা নয়াদিল্লি নিবাসী, ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকে কর্মরত। চাকরিসূত্রে পৃথিবীর বহু দেশে ভ্রমণ। লেখালিখি করছেন অনেকদিনই - বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধই বেশি, কিছু ভ্রমণকাহিনি - এর আগে সবই ইংরেজিতে। বিশেষ শখ ফোটোগ্রাফি।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

আলাস্কার অন্দরে

সচ্চিদানন্দ দত্ত

~ আলাস্কার আরও ছবি ~

উপক্রমণিকা

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ৪৯ তম রাজ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত আলাস্কা মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন, মাঝখানে কানাডা। আয়তনে বিশাল - ভারতবর্ষের অর্ধেক। আর জনসংখ্যা? ব্যারাকপুর থেকে বেলঘড়িয়া যত লোক তার চেয়েও কম - কুল্লে সাত লাখ চল্লিশ হাজার। তায় আবার এর অর্ধেক মানুষ বাস করেন অ্যাঙ্করেজ শহরে - আলাস্কার বৃহত্তম শহর। উত্তর মেরুরেখা (Arctic Circle) মাঝ বরাবর বিস্তৃত, শীতকালে অরোরা বোরিয়ালিস দেখা যায়। সুতরাং আমাদের এই রোদ বৃষ্টি ঘাম থেকে হাজার যোজন বিপরীতে উত্তর মেরুর কোলঘেঁষা এও এক নিশীথ সূর্যের দেশ - ঠান্ডা আর বরফের চাদর ঢাকা। তবে সেসব শীতকালে। গরম কালে আলাস্কা এক নিসর্গ স্বর্গ।

প্রস্তুতি

মোটামুটি ভাবে আলাস্কায় দুটো সার্কিটে ট্যুর হয়। বেশি জনপ্রিয় 'ইনসাইড প্যাসেজ' - বিশাল বিলাসবহুল জাহাজ বা ক্রুইজে - প্রায় একটা ফাইভ ষ্টার হোটেলের ব্যবস্থাপনা নিয়ে ভাসমান। অন্য দেশের আর বয়স্কদের কাছে এটাই সুবিধেজনক, বুক করলেই আর কোনও অসুবিধা নেই। আমি অন্য সার্কিটটা নিয়েছিলাম, সাউথ সেন্ট্রাল আলাস্কা - যাতে মেনল্যান্ডের অভ্যন্তরেও বেশ কিছুটা সেঁধানো যাবে আর আলাস্কার আত্মাটা যদি কিছু অনুভব করা যায়। আমেরিকানরা অনেকেই এভাবেই ঘোরেন। কিন্তু ড্রাইভার চাই। নিজেদেরই ড্রাইভ করতে হবে, রেন্টাল কার তুলনামূলক শস্তায় পাওয়া যায়, পেট্রলের দাম আমাদের চেয়েও কম, লিটার পিছু পঞ্চাশ টাকা। বড় ছেলের কাঁধে ভর করে বুকিং শুরু করে দিলাম,ও ভালোই ড্রাইভ করে। তবে ক্রুইস ও ল্যান্ড জুড়ে ঘোরা যায়, অবশ্যই সেটা আরও সময় ও খরচ সাপেক্ষ। আর আছে আর ভি রেন্টাল - ক্যারাভান বা চলমান বাড়ি, হোটেল বুক করার ঝামেলা নেই, এও বেশ জনপ্রিয়।

অ্যাঙ্করেজ আলাস্কার বৃহত্তম শহর, এখান থেকেই যাত্রা শুরু। কেনাই ফোর্ড ও দেনালি - দুটো ন্যাশনাল পার্ক ঘোরা মনস্থ করলাম। অ্যাঙ্করেজ, সিওয়ার্দ, পামার ,দেনালি দু দিন করে মোট আট দিনের বুকিং সেরে ফেললাম। জুন থেকে সেপ্টেম্বর টুরিস্ট সিজন, বাকি বছর শুনশান, বরফ আর ঠান্ডার কব্জায়। তাই হোটেলের ভাড়া একটু বেশি। ঝোপ বুঝে আর নেট ঘেঁটে কিছুটা কমে ম্যানেজ করা গেল। কোথায় থামব, কতটা চলব এই স্বাধীনতাটাই এ ভাবে ঘোরার প্রাপ্তি।

অ্যাঙ্করেজ

তেসরা জুন ২০১৬, বিকেল সাড়ে চারটেতে যখন প্লেন ছাড়ল, সানফ্রান্সিসকোতে ঝকঝকে দুপুরই বলা চলে। সাতটায় সল্টলেক সিটি - তখনও বাইরে বেজায় আলো। রাত সাড়ে এগারোটায় যখন অ্যাঙ্করেজ-এ নামলাম তখনও দিব্যি দিনের আলো। পরদিন শহর ঘোরাঘুরি। প্রথমে কিনকেড পার্ক - সমুদ্রের কাছেই,পরপর পাঁচ-ছটা মাঠে তুমুল ফুটবল খেলা চলছে,কচিকাঁচা থেকে বড়রা সবাই সামিল। মাঠ ঘিরে প্রচুর দর্শক - শিক্ষক ও অভিভাবকেরা। রীতিমতো মেলা। শহর ঘুরতে লাগলাম - চওড়া ঝকঝকে রাস্তা, ছিমছাম বাড়ি ঘর, ধোপদুরস্ত দোকানপাট ও ডাউনটাউন-এ উঁচু উঁচু বহুতল - টিপিকাল আমেরিকান শহর। মাঝে সাবওয়েতে লাঞ্চ সেরে অ্যাঙ্করেজ মিউজিয়ামে ঢুকলাম। মূলত ছবি ও ভিডিও সহযোগে উত্তরের আবহ ধরার প্রয়াস - ইতিহাস ও সংস্কৃতি। ঠিক হৃদয়গ্রাহী হয়নি। এরপর ঘুরতে ঘুরতে গেলাম ফিশ ক্রিকে - ছোট্ট নদী, চওড়া কিন্তু হাঁটু জল। সেখানে উদ্দাম মাছ ধরা চলছে, মায় নদীতে নেমে পর্যন্ত, পায়ে গামবুট, সুদৃশ্য হুইলঅলা ছিপ, পাশে মাছ রাখার কনটেনার, গায়ে বর্ষাতি - সে এক এলাহি কারবার! নতুন নতুন লোক নব নব উদ্যমে এই মাছ ধরার মচ্ছবে এসে লেগে পড়ছে। সবাই ট্যুরিস্ট। আসলে বহু আমেরিকানের কাছে আলাস্কায় মাছ ধরা এক বিরাট বিনোদন ক্ষেত্র। দেখতে দেখতে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ জন "মৎস্য মারিব খাইব সুখে" বুঁদ হয়ে গেল। জায়গাটা সত্যিই খুব মনোরম। প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ হোটেলমুখো হলাম, তখনও পার্কিং লটে নতুন গাড়ি ঢুকছে। তবে ওই তিন ঘণ্টায় কারও কাছে একটা মাছের লেজ পর্যন্ত দেখিনি।

ফিশ ক্রিক, অ্যাঙ্করেজ

সেওয়ার্দ হাইওয়ে

কেনাই ফিওর্ড ন্যাশনাল পার্ক

এবার রওনা সেওয়ার্দ, ১৩০ মাইল পথ। একদিকে পাহাড় উঠে গেছে প্রায় খাড়া, অন্যদিকে সমুদ্র খাঁড়ি - টার্ন এগেইন আর্ম। অসাধারণ রাস্তা। তিন ঘন্টার পরিবর্তে পাঁচ ঘন্টা লেগে গেল - থামতে থামতে, নামতে নামতে - ছবির মতো। পরের দিন লঞ্চ ট্যুর ন্যাশনাল পার্কের অভ্যন্তরে। ঠিক ঘড়ি ধরে দশটায় ছেড়ে দিল। আলাস্কা যথার্থই একটা ইউ.এস.এ. স্টেট,অনেক ব্যাপারেই। যাইহোক রেজারেকসন বে ধরে লঞ্চ এগিয়ে চলল ২২ নট স্পিডে, বসার ব্যবস্থাপনা সুন্দর। দুপাশে পাহাড় আর মাথায় গায়ে ছোপ ছোপ বরফের চুমকি। আধ ঘন্টাটাক বাদে একটা খাড়া পাহাড়ের গা ঘেঁসে লঞ্চ প্রায় দাঁড়িয়ে গেল,বেশ কিছু করমোরান্ট পাখি বসে আছে, কালো ও লাল ঝুঁটি। কিছুক্ষণ বাদে একটি ছোট্ট পাহাড়ি দ্বীপের দিকে লঞ্চ ধীরে ধীরে সরতে লাগল, গায়ে এবং খাঁজে অনেকগুলো সি-লায়ন (Sea-Lion) শুয়ে আছে পরম নিশ্চিন্তে, আলস্যে - বিস্মিত হচ্ছিলাম থেকে থেকে! ডেকে একজন গাইড ছিলেন,তিনিই সব দেখাচ্ছিলেন। এরপরে একটা জায়গায় পৌঁছে লঞ্চের গতি ঢিমে হয়ে এলো আর পরক্ষণেই একটা বিজাতীয় আওয়াজ শুনতে পেলাম - তিমির ডাক, লঞ্চ থেকেই করা হচ্ছিল! তারপরে একেবারে হই হই পড়ে গেল - সমুদ্রে এখানে ওখানে ঝলকের মত ভেসে উঠছে ডরসাল ফিন, কালো পিঠ আর লেজ - কিলার হোয়েল (Killer Whale)। কোনটা মাদি কোনটা বাচ্চা - আমাদের পাইলট মাইকে তার ধারাবিবরণী দিতে লাগলেন, ছবি তোলার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। এর পরে আর এক জায়গায় সি-লায়ন দেখিয়ে লঞ্চ হাজির একটা দ্বীপ আর পাহাড়ের মাঝে - অনেক পাফিন (Puffin) উড়ে বেড়াচ্ছিল,সুন্দর পাখি। এরপরে দেখলাম বিশালাকায় হাম্পব্যাক তিমি (Humpback Whale) - ভুস ভুস করে কালো পিঠ পাহাড়ের মত ভেসে উঠছিল। একটা ধূসর হোয়েল (Grey Whale) -এর লেজও এক জায়গায় দৃশ্যগোচর হল। দুটো বল্ড ঈগল (Bald Eagle) বসে আছে একটা ক্লিফের চূড়ায়, এরাই আমেরিকার জাতীয় পাখি, এক সময় বিলুপ্তির পথে চলে গিয়েছিল। আমেরিকান গভর্নমেন্ট আইন ও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ায় ওরা আজ স্বমহিমায়। দুঃখের বিষয় আবহাওয়া বেশ খারাপ ছিল - কনকনে ঠান্ডা ঝোড়ো হাওয়া আর একনাগাড়ে বৃষ্টি - ঝিরঝিরে। তাতে অবশ্য উৎসাহে কোনো ভাঁটা পড়েনি কারোরই। লঞ্চ এবার এসব ছেড়ে দ্রুত এগিয়ে চলল...

আলালাইক গ্লেসিয়ারে ভাসমান সীল

বেশ কয়েক মাইল ফুল স্পিডে গিয়ে একটু ধীরগতি হল লঞ্চ। বাঁদিকে তাকিয়ে দেখি অনেক ছোট ছোট সাদা টুকরো ভেসে আসছে,ভালো করে ঠাওর করতেই স্পষ্ট হল ছোট-বড় বরফ খণ্ড, অসংখ্য। সামান্য বাঁক নিয়ে একটু কাছে ভিড়তেই ভেসে উঠল নীলচে সাদা চাপ চাপ জমাট বরফের ক্যানভাস। ঝিরঝিরে বৃষ্টি, ঝোড়ো বাতাস আর মেঘলা আকাশের ম্যাড়ম্যাড়ে পরিমন্ডলে ঝকঝক করে উঠল এক অদ্ভুত শুভ্রতার জমক - আলালাইক গ্লেসিয়ার। মাঝে মাঝেই অংশ বিশেষ ভেঙে পরছে সমুদ্রে, সশব্দে। সামনের অনেকখানি অঞ্চল ভাসমান অসংখ্য বরফ খণ্ডে থোকা থোকা সাদা ফুলের কার্পেট হয়ে আছে আর বেশ কিছু সীল তার ওপর বসে আছে,ছড়িয়ে ছিটিয়ে। সিগালেরা উড়ে বেড়াচ্ছে। ঝোড়ো হাওয়ার শোঁ শোঁ আওয়াজ আর বরফ ভেঙে পড়া। সবমিলিয়ে আমাদের সে এক বাকরুদ্ধ অবস্থা। এ কী দেখলাম!

ফেরার পথে আরও দুটো গ্লেসিয়ার হলগেট ও বেয়ার দেখে (একটু দূর দিয়ে) আমাদের লঞ্চ একটা খাড়া পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়াল - প্রায় ৩০০ ফুট ওপর থেকে ঝরনা সরাসরি নেমেছে সমুদ্রের বুকে। আর ঠিক তখনি আমাদের ক্যাপ্টেন একটি কবিতা আবৃত্তি করে উঠলেন। এই রেজারেকসন বে - এই কেনাই ফিওর্ডের মর্মবাণী তাঁর কণ্ঠ থেকে যেন ঝরে পড়ল। অসাধারণ! আরও কিছু সি লায়ন, তিমি, পাফিন পাখি দেখিয়ে লঞ্চ এসে থামল ফক্স আইল্যান্ড-এ। স্যামন মাছ সহযোগে ডিনার সেরে হারবারে ফিরে এলাম। লঞ্চ থেকে নামার সময় ক্যাপ্টেনের সঙ্গে একটা ছবিও নিলাম। জানলাম, কবিতাটি ওঁরই লেখা। আট ঘন্টা কোথা দিয়ে যে শেষ! কিন্তু মন ভরে থাকল এই অসাধারণ প্রকৃতির চলমান চালচিত্রে আর মন ছুঁয়ে গেল প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়া একজন কেজো মানুষের কবিতার অনুরণনে।

মাতানুসকা গ্লেসিয়ার

সেওয়ার্ড থেকে পামার ১৭১ মাইল। মাঝে পোরতেজ বলে একটা জায়গায় আলাস্কা ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন সেন্টারে ঢুকলাম। আহত বা পরিত্যক্ত প্রাণীদের আশ্রম বলা যায়। কেউ কোনও একটি প্রাণীকে পোষ্যও নিতে পারে, ওদের তত্ত্বাবধানে। একে একে দেখলাম গ্রিজলি ভাল্লুক (Grizzly Bear),কারিব্যু হরিণ (Caribou Deer), এল্ক (Elk), শজারু (Porcupine), মুজ হরিণ (Moose Deer),লাল শেয়াল (Red Fox),মাস্ক অক্স (Musk Ox) - খাঁড়ির ধারে বিশাল বিস্তৃতিতে রাখা আছে। জনমানবহীন - প্রকৃতির ক্যানভাসে।

চমৎকার এলাম। অ্যাঙ্করেজ হয়ে। দিব্যি রাস্তা। পামার আলাস্কার বেশ একটা পুরোনো শহর। ঝকঝকে বাড়ি ঘর আর চওড়া চওড়া রাস্তার কোনো কমতি নেই, দোকানপাটও বেশ। কিন্তু এক লহমা দেখলে মনে হবে মৃত্যু পুরী, সেই রূপকথার রাক্ষসের মরণ কাঠি ছুঁয়ে দেবার মত... কেউ কোথাও নেই, অনেক গাড়ি পার্ক করা আছে... মাঝে সাঝে দু-একটা গাড়ি হুসহাস বেরিয়ে যাচ্ছে। হোটেলের রিসেপশানে গিয়েও দেখি সেই একই - কেউ নেই, সব ভোঁ-ভা।

বিকেলে ব্রিজ পেরিয়ে নদীর ধারে গেলাম - মাতানুসকা নদী, মোহনার কাছাকাছি, বেশ অনেক চওড়া। নামটা আমেরিকান নয়। প্রায় দেড়শ বছর আগে ১৮৬৭ সালে রাশিয়া এই আলাস্কাকে আমেরিকার কাছে বেচে দেয় মাত্র ৭২ লক্ষ ডলারে। এখনও কিছু কিছু নদী, পাহাড়, বন্দর সেই রাশিয়ান স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছে। যেমন এই নদীর নাম - মাতানুসকা। নদীর পাড়ে সুন্দর ট্রেল... শুনশান,দূরে বরফাবৃত শৃঙ্গ,চারপাশে জঙ্গল - সবমিলিয়ে দুর্দান্ত একটা দৃশ্যপট। বিকেলটা ভালোই কাটল। সাড়ে আটটা নাগাদ হোটেলে ফিরলাম। তখনও ঝকঝকে রোদ। সত্যি কথা বলতে

কী সারা আলাস্কা ভ্রমণে রাতের অন্ধকার কখনও দেখিনি, ঘুমোতে যাওয়া থেকে ঘুম ভাঙা সবই দিনের আলোয় আলোয় কাটছে।

মাতানুসকা গ্লেসিয়ার

পরের দিন দশটা নাগাদ গ্লেন হাইওয়ে ধরলাম,পাহাড়ি রাস্তা কিন্তু চওড়া এবং চমৎকার। ষাট মাইল রাস্তা ঘন্টাদেড়েকে পার হলাম। মাতানুসকা নদীর ধার ধরে চলা, পার্বতী নদীর গা বেয়ে মণিকরণ যাওয়ার কথা মনে পড়ে গেল। হাইওয়ে থেকে তিন মাইল ভেতরে ঢুকে যেখানে গাড়ি পার্ক করলাম তার গা ঘেঁষেই প্রায় গ্লেসিয়ার, মাতানুসকা। নদীর উৎপত্তি এখানেই। শ'পাঁচেক ফুট পা বাড়াতেই গ্লেসিয়ারের ওপর এসে পড়লাম - ধুলো বালি নুড়ি পাথরে একটু কালচে হয়ে আছে কিন্তু হাঁটলেই জুতোয় আওয়াজ উঠছে। আর এখান ওখান ফুঁড়ে সারা জায়গা জুড়ে জল বেড়িয়ে আসছে,কোথাও শুধু ভিজে কোথাও জলের ধারা। সারা জায়গায় জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে একটা গোটা নদীর উৎপত্তি! ভাবলেই কেমন অবাক লাগছে। আরও কিছুটা এগিয়ে গেলাম - বরফ এখন শক্ত ও সাদা। আরো ওপরে বরফের রং নীলচে। কিন্তু ক্ষান্ত দিলাম,পায়ে আইস স্যু আর হাতে লাঠি থাকলে এগোতাম, সেরকম খাড়া নয়। আলাস্কার বৃহত্তম মটোরেবল গ্লেসিয়ারে অনেক ছবি-টবি তুলে ফেরার পথ ধরলাম।

দেনালি ন্যাশনাল পার্ক

সামনে তিনটে গাড়ি পর পর দাঁড়িয়ে গেল, নট নড়ন চড়ন। শেষ পর্যন্ত যখন এগোল দেখি একটা মুজ আর তার বাচ্চা পাতা খেয়ে যাচ্ছে, একমনে। মুজ হল বিশাল হরিণ, প্রায় পাঁচশ কেজি ওজন। পার্কে ঢোকার আগেই প্রাণী দর্শন হয়ে গেল। প্রসঙ্গত বলে রাখি, গাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমরা আগের দিনই আঙ্করেজ থেকে হিলি এসেছি বাসে ২৬০ মাইল। এরপর পার্কের সবুজ বাসে রওনা হলাম, ৬০ মাইল যেতে হবে। যাওয়া-আসা সবমিলিয়ে আট ঘন্টার এই অভিযান। মাইল দশেক চলল উত্তেজনাহীন পাহাড়ি পথ। তারপর বাঁক ঘুরতেই চমক। চারদিকে ছোপ ছোপ বরফের পাহাড় আর দূরে উত্তুঙ্গ শুভ্রতার ঝলক - মাউন্ট দেনালি, উত্তর আমেরিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় এই শৃঙ্গ বারে বারে ধরা পড়েছে পুরো যাত্রাপথে - অসাধারণ। এরপর নজরে এল আকাশে উড়ন্ত দুটো সোনালি ঈগল (Golden Eagle), রাস্তার ধার দিয়ে ছুটে গেল আর্কটিকের মেঠো কাঠবিড়ালি (Arctic Ground Squirrel)। দশ বিশ মাইল ছাড়া ছাড়া রেস্ট রুম, দশ মিনিট বাস থেকে নামার বিরতি। ক্রমশ আমরা ওপরে উঠছি। গ্রেট আলাস্কান রেঞ্জ আমাদের বাঁ দিক দিয়ে চলেছে,প্রতিটি বাঁকে নতুন নতুন দৃশ্যপট,বরফ এবং পাহাড় নতুন নতুন ছন্দে। হঠাৎ বাস থেমে গেল,হৈ হৈ করে উঠতে উঠতে সব নিশ্চুপ,হাতে হাতে ক্যামেরা উঠে এল,কে কোথা দিয়ে লেন্স গলিয়ে ক্লিক করবে - একটা গ্রিজলি ভাল্লুক হেলে দুলে চলেছে রাস্তার ঠিক মাঝখান দিয়ে। বাস আবার চলতে লাগল। মাঝে মধ্যেই পাহাড়ি নদী,ঝরনাধারা। হটাৎ ফক্স ফক্স বলে একটা বোল উঠল। শেয়াল! সে আবার দেখার কী আছে! আমেরিকানদের আদিখ্যেতা। ছোঃ। বসেই ছিলাম। কিন্তু আবছা নজরে পড়তেই মুখ বাড়ালাম। বাব্বাঃ! এতো বাহারি! ঝাঁকড়া লেজ, লালচে রঙিন গা - লাল শেয়াল। রাস্তার পাশ দিয়ে চলে গেল। বেশ!

ডাল শীপ , দেনালি

ক্রমে ক্রমে নজরে পড়ল ক্যারিব্যু হরিণ -ডাল পালার মতন শিং আর ডাল ভেড়াদের (Dall Sheep)। ভেড়াগুলো দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের প্রত্যন্ত গায়ে, বরফের মত সাদা গা, মোটা বাঁকানো শিং। পৌঁছলাম এইলসন সেন্টারে - আমাদের বাস যাত্রার শেষ প্রান্ত। সুন্দর হাঁটাপথ নেমে গেছে বিস্তৃত নদীখাতে। পা চালালাম, পরের বা তারও পরের বাসে ফিরব। কনকনে ঠান্ডা হাওয়া ছুরির মত বিঁধছে, তবু ভালোই লাগছিল। মাঝে একটা উত্তুরে কাঠবিড়ালী একটু মশকরাই করল বলা যায়। তাড়া করতেই দৌড় লাগাল, একটু গিয়েই খাড়া দাঁড়িয়ে গেল দু পায়ের ওপর। আমরা এগোচ্ছি দেখেও ভ্রুক্ষেপ নেই। কাছাকাছি গিয়ে ছবি তুললাম। ঠায় দাঁড়ানো, মাঝে মধ্যেই ক্রিক ক্রিক করে তীক্ষ্ণ আওয়াজ করছে,যেন আমাদের বকছে। আরও কাছে প্রায় হাতের নাগাল হতেই মুহূর্তে অদৃশ্য। আসলে ওর পায়ের কাছেই গর্ত ছিল - বাসা। তিনটে পনেরোর ফেরার বাস ধরলাম। আসার পথের উল্লেখযোগ্য - পাহাড়ের অনেক উঁচু দিয়ে এক পাল ডাল ভেড়ার চলে যাওয়া। দুর্দান্ত। এই ডাল ভেড়াদের পর্যবেক্ষণের সূত্র ধরেই এই পার্কের সূত্রপাত, আগামী বছর প্লাটিনাম জুবিলী।

জ্যাক-এর গাড়িতে ফেরার পথে আর এক নাটক। পার্ক থেকে বেরিয়ে হাইওয়েতে উঠেছি, হিলির পথে হু হু করে চলছে গাড়ি, হঠাৎ রেলিং টপকে গাড়ির সামনে একটা মুজ মা আর তার বাচ্চা। মুহূর্তে ব্রেক - মা ছিটকে বেরিয়ে গেল সামনে, বাচ্চা ভয়ে পিছিয়ে। চুলচেরা বাঁচা। দুজনেই। হতচকিত দুটোই ওপাশের রেলিং টপকে অদৃশ্য জঙ্গলে। আমরা থ। ঈশ্বরের বাগানের সৃষ্টিরা অক্ষত ফিরে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

প্রত্যাগমন

আজ আলাস্কায় শেষদিন। বেড়ানোর শেষ কিন্তু বেড়ানো জারি কারণ ফ্লাইট ধরতে যেতে হবে ফেয়ারব্যাঙ্কস - একশো মাইল দূরে। আবার পার্কস হাইওয়ে, এদিকটা আরও নির্জন আরও ছমছমে - লোকবসতি তো নেইই, গাড়ি ঘোড়াও কম। আমরা চলেছি আলাস্কার আরও অভ্যন্তরে - যথার্থই পাণ্ডব বর্জিত অঞ্চল। আমাদের সহযাত্রী দুটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল, সুদূর পোল্যান্ড থেকে আসছে সামারে রোজগারের কনট্র্যাক্ট নিয়ে

- মোটামুটি ইংরেজি শিখেছে। মাঝ পথে নেনানা বলে একটা শুনশান জায়গায় নেমে গেল। শুনলাম পূর্ব ইউরোপ থেকে সামারে অনেকেই শর্ট টার্ম জব করতে এখানে আসে, ইংরেজি জানলেই চলবে। ফেয়ারব্যাঙ্কস পৌঁছে ঢুকলাম নর্দার্ন ইউনিভারসিটির মিউজিয়াম-এ। ফেরার আগে আলাস্কার ইতিহাস আর প্রত্যন্ত অধিবাসীদের জীবন যাত্রার রূপরেখা কিছুটা অনুভব করতে পারলাম। আলাস্কার বিভিন্ন দুর্গম জায়গায় খনন চালিয়ে প্রচুর ডাইনোসরাস এবং ম্যামথ-এর হাড়গোড় উদ্ধার করে রাখা আছে এখানে। আলাস্কা ডাইনোসরাসদের মূল ঘাঁটি ছিলও বলা যায়। এরপর শেষ পর্যন্ত আমরা এয়ারপোর্টে পৌঁছালাম। দেখলাম এটাই বোধহয় একমাত্র আমেরিকান এয়ারপোর্ট যেখানে সিকিওরিটি শিকেই চড়ানো। কাজের ফাঁকে ফোকরে চলছে দেদার আড্ডা। প্লেন ছাড়ল রাত দুটোয়, বাইরে উঁকি মেরে দেখি অন্ধকার, রাত্রির অন্ধকার এই প্রথম আলাস্কায়! মুখ থেকে বেরিয়ে এল স্বগোতক্তি, বেশ জোরেই - গুড নাইট, গুড নাইট আলাস্কা।

মাতানুসকা গ্লেসিয়ার

~ আলাস্কার আরও ছবি ~

চক্ষু শল্যচিকিৎসক হওয়ার সুবাদে ব্যারাকপুরের ডাঃ সচ্চিদানন্দ দত্তের চিরকালই সময়ের বড় টানাটানি। তাতে অবশ্য নিয়ম করে বেরিয়ে পড়া আটকায়নি। ভ্রমণ তাঁর কাছে জীবনের এক মহার্ঘ অনুষঙ্গ - যা চলার পথে মনের শক্তি ও রসদ যোগায়। লেখার প্রয়াস এই প্রথম।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

স্মৃতিতে শ্যামদেশ

শ্রাবণী ব্যানার্জী

~ থাইল্যান্ডের আরও ছবি ~

কলকাতা থেকে ব্যাংকক যাত্রাকে এখন একটা দারুণ ফরেন ট্রিপ বললে অনেকে একটু মুখ টিপে হেসেই ফেলবেন হয়তো। ইদানীং বাঙালিরা প্রায় সের দরে টিকিট কেটে থাইল্যান্ড ভ্রমণে যাচ্ছেন। তাঁদের কাছে সেটি দিল্লি বা মুম্বাই যাওয়ারই সামিল বরং অনেক কম টাকাতেই ভালো ভালো হোটেলে থাকছেন আর ব্যুফে ব্রেকফাস্টে একেবারে আকণ্ঠ খেয়ে রাস্তাঘাটে পা মাসাজ করাতে বসে যাচ্ছেন। এমন কী থাইল্যান্ডে গেলে বাংলায় লেখা 'বাঙালির গর্ব' দর্জির দোকানও দেখতে পাবেন। বাস্তবিক থাইল্যান্ডের মত সস্তায় ভালো হোটেল, মুখরোচক খাওয়া আর নানা ধরণের সুস্বাদু ফলের সম্ভার পৃথিবীতে খুব কম দেশেই আছে। তাছাড়া বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে কিনা জানি না, এদেশের মানুষগুলিও বড় শান্তিপ্রিয় আর ব্যবহারও সুন্দর তাই একবার গেলে মনে হয় যেন বারবার এখানেই ফিরে আসি।

আমি যে যুগে প্রথম থাইল্যান্ড পাড়ি দিই সে সময়ে এখনকার মত হুট বলতে ছুট বিদেশ ভ্রমণ তো দূরের থাক সাধারণের কাছে প্লেনে চাপাটাও ছিল এক বিরাট ব্যাপার। মনে আছে ছোটবেলায় কেউ একটা বিদেশি সাবান হাতে দিলেই আনন্দে লাফাতে থাকতাম। তাই আজও সেই বহুযুগ আগে ফেলে আসা আমার প্রথম বিদেশ যাত্রার দিনটি যেন চোখের সামনে ভেসে আসে। স্মৃতির পর্দাটিকে বহুক্ষণ ধরে সরালে তবেই সেখানে চোখে পড়বে উঁকি ঝুকি দিচ্ছে এক অসীম কৌতূহলী কুড়ি বছর বয়সী মেয়ের মুখ। সেটা ছিল আশির দশকের প্রথম দিক। মেয়েটি যদিও বিবাহিতা তবুও পিত্রালয়েই থাকে কারণ তার স্বামী তখন জাপানে। সাতমাস সেখানে কাটিয়ে আজকের এই ভ্রমণকাহিনির লেখিকাটিকে তিনি কলকাতা থেকে ব্যাংকক যেতে বলেছিলেন তাহলে ক'টাদিন খুব হৈ হৈ করে কাটানো যাবে। তার আগে বিদেশ ভ্রমণ তো ছেড়েই দিন জ্ঞানত কোনদিন প্লেনেই চাপিনি তাই আনন্দে একবারে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম। বয়সে কুড়ি হলেও আমার সেদিনের আকৃতি প্রকৃতি কোনওটাই সে সাক্ষ্য দিত না। যাত্রার দিন পরণে ছিল সালোয়ার কামিজ আর শ্যাম্পু করা চুলে আমার দিদিমার দ্বারা রচিত মাথার দুধারে দুটি কলাবিনুনি। ওঁর ধারণা ছিল বিদেশ বিভুঁইয়ে লম্বা লম্বা বেণী ঝুলিয়ে গেলে নজর লেগে যাবার সম্ভাবনা।

প্লেনে ওঠার সাথেসাথেই আমার পাশে এক অসম্ভব কেতাদুরস্ত স্যুট পরা ভদ্রলোক এসে বসলেন। সবকিছু নিয়ে তার চেহারাটি এতটাই রাশভারি ছিল আর যেরকম খাঁটি সাহেবি ইংরেজি উচ্চারণে তিনি এয়ার হোস্টেসের সঙ্গে কথা বলছিলেন যে, সেসব দেখে আর আলাপ করতে সাহস পাইনি। পোশাক বা গ্ল্যামারে একেবারে পারফেক্ট টেন। আমাকে মাথা নিচু করে পাশে বসে থাকতে দেখে হঠাৎ করেই হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন 'হ্যালো আই অ্যাম মিস্টার মুখার্জি'। ব্যাস্ যেই না বলা আমি আনন্দে সবকিছু ভুলে 'ওমা আপনি বাঙালি' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম! ভদ্রলোক বেগতিক দেখে বললেন, 'তোমার বাবা-মা অন্য কোথাও বসেছেন বুঝি'? ওঁর বিশেষ দোষ ছিল না, একে তো মাথায় কলাবিনুনি তাতে আবার এতটাই রোগা ছিলাম যে বয়েস আন্দাজে আমাকে ঢের বেশি ছোট দেখতে লাগতো। রেগে গিয়ে বলেছিলাম, 'বাবা মা কেন আসবে? আমি টিন এজার নই, কুড়ি বছর বয়েস আর ম্যারেড'। ভদ্রলোক থতমত খেয়ে বলেছিলেন, 'ও সরি, তবে আমার বয়স কিন্তু বিয়াল্লিশ, তাই তুমি বললাম বলে রাগ করোনি তো?' চোখ প্রায় কপালে তুলে বলেছিলাম 'ও বাবা বিয়াল্লিশ? তাহলে তো আমায় তুমিই বলবেন।' হায়, তখন কি আর জানতাম আমার জীবনেও এমন একটা দিন আসবে যখন বিয়াল্লিশের দিকেও স্নেহের চোখে তাকাতে হবে!

কথাচ্ছলে জানিয়েছিলেন, বহুদিন ইংল্যান্ডে কাটিয়ে ব্রিটিশ গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় কলকাতায় ফিরে গেছেন আর এখন কোম্পানির কাজে মাঝে মধ্যেই থাইল্যান্ড দৌড়াতে হয়। তখন আমার কাছে সব ল্যান্ডই ছিল ফরেন আর সেই সুবাদে ইংল্যান্ড থাইল্যান্ড তো একেবারেই ভাই ভাই। এক মুহূর্তও আর মুখ বন্ধ রেখে সময় নষ্ট করিনি, তিন ঘন্টার প্লেনযাত্রাতে দুটি ল্যান্ড সম্বন্ধেই অনর্গল প্রশ্ন করে ভদ্রলোকের মাথা প্রায় বিগড়ে দিয়েছিলাম। আশেপাশে সিট ফাঁকা থাকলে তিনি অবশ্যই সেটিকে সদ্ব্যবহার করতে ছাড়তেন না, নেহাৎ প্লেন প্রায় ভর্তি থাকায় বিশেষ সুবিধে করতে পারেননি। অগত্যা হাল ছেড়ে দিয়ে আমার প্রতিটি প্রশ্নেরই উত্তর দিতে দিতে গিয়েছিলেন এমন কী চকোলেট খেতে ভালোবাসি শুনে রেঙ্গুন এয়ারপোর্ট থেকে অনেকগুলো চকোলেট কিনে উপহারও দিয়েছিলেন।

ব্যাংককে নেমে দূর থেকে এক মুখ চাপা দাড়ি, ঝাঁকড়া চুল ও চোখে গগলসসহ একটি লোককে হাত নাড়াতে দেখে ভয় পেয়ে বলেছিলাম -'দেখুন না মিঃ মুখার্জি ওই দাড়িওয়ালা লোকটা তখন থেকে আমার দিকে হাত নাড়িয়ে যাচ্ছে, আপনি আমাকে আমার হাজব্যান্ডের হাতে তুলে দিয়ে তবেই হোটেলে যাবেন।' তখন বিদেশে বিভুঁইয়ে বাঙালিরাই ছিল বাঙালিদের পরম বন্ধু ও রক্ষাকর্তা। অবশেষে আর একজনের সঙ্গে হনহনিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখে আমার স্বামীর টনক নড়ে আর আমিও পেছন থেকে আমার নামটি শুনে নিজের ভুল বুঝতে পারি। ভেবেছিলাম আমার এই লেটেস্ট পারফরমেন্সটি দেখার পর ভদ্রলোক সত্বর অদৃশ্য হয়ে যাবেন আর নিজের ব্যাচেলার থাকার সিদ্ধান্তটিকে নিজেই সাধুবাদ জানাবেন, কিন্তু বাস্তবে হল ঠিক তার উল্টো। উনি কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে বললেন 'কাল সকালে তোমরা দুজনে তৈরি হয়ে থেকো আমি নিজে এসে তোমাদের ব্যাংকক শহরটা ঘুরিয়ে দেখাব।' আমরা তো শুনে হাঁ। এখন হলে কোনও উদ্দেশ্য আছে মনে করে ধারে কাছেই ঘেঁষতাম না, কিন্তু তখন আমাদের বয়েসটাও ছিল অতি অল্প আর যুগটাও ছিল একটু ভিন্ন।

পরেরদিন সকালেই উনি গাড়ি নিয়ে আমাদের হোটেলে চলে এলেন। সেদিন আমাদের প্রথম গন্তব্যস্থল ছিল রাজবাড়ি। ব্যাংককের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে চাওপ্রায়া নদী আর তার ধারেই এই রাজবাড়িটি। সতেরোশো বিরাশি থেকে উনিশশো পঁচিশ সাল পর্য্যন্ত রাজপরিবারসহ রাজা এখানেই বাস করতেন। তার আগে ব্যাংককের পাশেই আয়ুথায়াতে রাজধানী ছিল, যা কিনা অযোধ্যারই অপভ্রংশ আর তারই ইঁটপাথর দিয়ে এই রাজবাড়িটি তৈরি হয়। প্রথম রাজাকে ডাকা হত রাজা রাম বলে তাই বর্তমান রাজার নাম ভূমিবল হলেও তিনি হলেন নবম রাম। দুশো স্কোয়ার

ব্যাংকক রাজপ্রাসাদ

মিটার জুড়ে রাজবাড়িটা ঠিক তাক লাগানোর মত একটা বড় প্রাসাদ নয়, কেমন যেন টুকরো টুকরো ভাবে ছড়ানো, প্রতিটি রাজাই তাদের পছন্দমত কিছুটা করে বাড়িয়ে গেছেন। এখানেই প্রথম এক পিস পান্নার বুদ্ধমুর্তিটি দেখি। প্রায় ছশো বছর আগে উত্তর থাইল্যান্ডের এক মন্দিরে একটি ছোট সিমেন্টের বুদ্ধমুর্তি বাজ পড়ে ধ্বংস হয়ে যায় আর তার ভেতর থেকে এই ছাব্বিশ ইঞ্চি পান্নার বুদ্ধ মুর্তিটি বেরিয়ে আসে। রাজপ্রাসাদের দেওয়ালে রামায়ণের কাহিনি আঁকা ছবিগুলো দেখে খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। তখন মিঃ মুখার্জি বলেছিলেন, এদেশে দক্ষিণ ভারতের চোলা রাজবংশ অনেকদিন রাজত্ব করেছিল। ফলে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর প্রভাবও এখানে প্রচণ্ড। সারা থাইল্যান্ড জুড়েই শিব গণেশ ও ব্রহ্মামুর্তি দেখা যায় আর এদেশের লোক তাদের ভক্তি ভরেই পুজো করে। যে কারণে ব্যাংককের সুবর্ণভূমি বিমানবন্দরে সমুদ্রমন্থনের সময় দেবাসুরের যুদ্ধটাও খুব সুন্দর করে দেখানো আছে।

থাইল্যান্ডের সাথে ভারতবর্ষের মিল বহু দিক থেকেই। ওরাও আমাদের মতো হাতজোড় করে নমস্কার করে আর সেই অবস্থায় মাথাটা কতটা নামাচ্ছে তার ওপরে কাকে কতটা সম্মান দেখানো হচ্ছে সেটা নির্ভর করে। এদেশে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সম্মান সবথেকে বেশি তাই তাদেরকে হাতজোড় করে 'ওয়াই' করার সময় লোকজনের মাথা একেবারে কোমরের কাছে গিয়ে ঠেকে যায়। এখানে রাস্তার নাম 'নগরীন্দ্র', হাসপাতালের নাম 'বিভাবতী', স্টেশনের নাম 'অশোক', সি-বিচের নাম 'কমলা', নারকেল হল 'নালিকিয়া', বিশ্ববিদ্যালয়কে বলে 'মহাবিদ্যালয়' আর রাজার নাম তো আগেই বললাম 'ভূমিবল'। এদেশের লোকজন প্রতিটি কথাই অত্যন্ত টেনে টেনে বলে যেমন ধরুন অশোক এর উচ্চারন হবে অশো.....ক, মেয়েরা হ্যালো বললে হবে সোয়াদিকা.....এই শেষে 'কা' বা 'খা' বলে টানটা এমনই জোরালো যে শুনলে লোকজনের মুখই হাঁ হয়ে যাবে।

ওয়াট পো মন্দির

রাজবাড়ির খুব কাছেই 'ওয়াট পো' মন্দির। মিঃ মুখার্জি বলেছিলেন, এই মন্দিরের আঙিনাতেই নাকি প্রথম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে থাই মাসাজ শেখানো হয়। চতুর্দিকে অজস্র বুদ্ধমূর্তির মধ্যে সেদিন সবথেকে বেশি দৃষ্টি কেড়েছিল ছেচল্লিশ মিটার লম্বা একটি শোয়ানো বুদ্ধমূর্তি যার সঙ্গে বিষ্ণুর অনন্তশয্যার অনেকটা মিল আছে। তার সাইজ এমনই যে মুখ থেকে পা একসঙ্গে দেখা অসম্ভব। এখানে অনেকগুলি প্রকাণ্ড গোঁফসমেত পেল্লাই চিনে মূর্তি চোখে পড়ে। তারাই যেন মন্দিরের পাহারাদারের মতো চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে।

মাত্র কয়েক মাস আগেই আবার ব্যাংকক গিয়েছিলাম আর এই ওয়াট পোর সামনেই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। সারাদিনের জন্য ট্যুরিষ্ট বোটের টিকিট কেটে চাওপ্রায়া নদীর আশেপাশেই ঘুরছিলাম, একসময় শোয়ানো বুদ্ধটিকে আর একবার দেখার ইচ্ছায় ওয়াট পোর সামনেই নেমে পড়লাম। প্রায় সাথেসাথেই এক ভদ্রলোক 'নমস্তে' বলে এগিয়ে এসে ছোটবেলা থেকেই তিনি হিন্দি সিনেমার কতটা ভক্ত সেটি বোঝাতে লাগলেন। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বয়সের তফাৎ থাকায় সেফ সাইডে থাকার জন্য একেবারে শশীকাপুর থেকে শুরু করে দিলেন আর আমার কাছে এসে সেটি অমিতাভ বচ্চনে শেষ হল। পাশ থেকে আমার স্বামীর স্বগোতক্তি কানে এল – কী ভাগ্যি একেবারে রাজ কাপুর থেকেই শুরু করে দেয়নি! আমাদের দেখে লোকটি বিলক্ষণ বুঝেছিল যে ছোটবেলার স্মৃতিতে অযথা শাহরুখ খান বা ঐশ্বর্য্য রাইকে টেনে এনে কোনও লাভ নেই। রাজেশ খান্না মারা যেতে দুদিন ধরে চোখের জল ফেলেছে জানিয়ে বলল, 'এখন তো আর মন্দিরে ঢুকতে পারবে না কারণ মংক-রা প্রার্থনায় বসেছেন, তাই দেড় ঘন্টা রোদে দাঁড়িয়ে না থেকে একটা 'টুকটুক্' ঠিক করে দিচ্ছি কাছেই আর একটা মন্দিরে চলে যাও।' বহুবার ব্যাংককে এসে আমরাও এখন সেয়ানা হয়ে গেছি তাই সেকথা উপেক্ষা করে সোজা মন্দিরেই ঢুকে গেলাম আর বলা বাহুল্য মংকদের প্রার্থনায় বসার ব্যাপারটা পুরোটাই ভাঁওতা। তাকিয়ে দেখি লোকটা আমাদের দেখিয়ে যেভাবে দাঁত-মুখ খিঁচোচ্ছে যার সঙ্গে ডারউইনের থিয়োরি অর্থাৎ আমাদের পূর্বপুরুষদের চালচলনের বিস্তর মিল আছে।

এই ব্যাংককেই মাত্র বছর তিনেক আগে আমেরিকান শিল্পপতি 'জিম থমসন' যিনি প্রথম থাই সিল্ককে বিশ্বের দরবারে মর্যাদার আসনে বসিয়েছিলেন তার বাড়ি দেখে ফিরছি এমন সময় রাস্তাতেই একটি লোক এসে আমাদের পাকড়ালো। একটা অটো বা টুকটুক ধরিয়ে দিয়ে থাই সিল্কের এগজিবিশনে পাঠানোর নামে প্রথমে একটি জুয়েলারির দোকানে ঢুকিয়ে দিল। সেখানে সুবিধা হল না দেখে পাশের দোকানে নিয়ে গিয়ে ভালো জিনিসের প্রতি আমার স্বামীর চোখ কতটা তৈরি ইত্যাদি বুঝিয়ে তাকে একটা বড়সড় কাঠের হাতি গছিয়ে দিয়েছিল। সেদিন কোনও রকমে তাদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে হোটেলে ফিরে এসেছিলাম। আমার প্রথম ব্যাংকক দর্শনের সঙ্গে আজকের এই ট্যুরিস্টঠকানো ব্যাংককের অনেকটাই তফাৎ। কী ভাগ্যিস্ মিঃ মুখার্জিকে সেই যুগে দেখেছিলাম এখন হলে নির্ঘাৎ তাঁকেও এদের দলেই ফেলে দিতাম!

সেদিন ওয়াট পো থেকে বেরিয়ে উনি আমাদের ওঁর প্রিয় একটি থাই রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। জীবনে প্রথম থাই রান্না খেয়ে এত ভালো লেগেছিল যে সেই স্মৃতি আজও আমার কাছে অতি মধুর। গ্রিনকারি, প্যাড থাই, পেঁপে মেশানো ঝাল সোমটাম্ স্যালাড, তামকা বা তমইয়াম্ স্যুপ যাই খান না কেন লেমন গ্রাস ও নারকেল দুধ দিয়ে তৈরি থাই খাবার এক কথায় অনবদ্য। সেদিনই অবশ্য থাইল্যান্ডের হকার যে কী হতে পারে সেটি দেখারও সৌভাগ্য হয়েছিল। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরোনোর সঙ্গেসঙ্গেই একটি হকার উলের তৈরি হ্যামক কেনার জন্য ঝুলোঝুলি করতে লাগল। মিঃ মুখার্জি তাকে ঘাড় থেকে নামানোর জন্য সিকিভাগ দাম বললেন আর লোকটাও তৎক্ষণাৎ সেটিকে তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে পয়সা চাইল। আমরা তো দেখে থ। অগত্যা মিঃ মুখার্জি সেটিকে কিনে বললেন – 'আমি ব্যাচেলার মানুষ একা দুলে আর কী করব ভাই তোমরাই বরং এটাতে দোল খেও' বলে হ্যামকটি আমাদের হাতে ধরিয়ে দিলেন। এরপর উনি আমাদের সাড়ে পাঁচ টন সোনার বুদ্ধমূর্তি দেখাতে নিয়ে

থাই আহার

গিয়েছিলেন। প্রায় আটশো বছর আগে সুখোথাই রাজবংশের সময়ে এটি তৈরি হয়।
মাত্র কয়েক মাস আগেই সেই ঐতিহাসিক সুখোথাই জায়গাটি আবার দেখতে গিয়েছিলাম কিন্তু সে কথায় পরে আসছি। বার্মিজদের লুটের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সে সময়ে এই সোনার মূর্তিটিকে পুরু প্লাস্টার দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। আর মাত্র দুশো বছর আগে এদেশের রাজা ভেতরে সোনার অস্তিত্ব না জেনেই ব্যাংককের একটি মন্দিরে সেটিকে স্থাপনা করেন। উনিশশো চুয়ান্ন সালে মন্দির সংস্কারের সময় অত বড় মূর্তিটিকে তুলতে গিয়ে মাটিতে পড়ে প্লাস্টার ভেঙে গিয়ে ভেতর থেকে সাড়ে পাঁচটন সোনার বুদ্ধমূর্তিটি বেরিয়ে আসে। মিঃ মুখার্জি সেদিন বলেছিলেন, থাইল্যান্ডের কোনও মন্দিরে ঢুকে কোনও বুদ্ধের মুখ যদি একটু লম্বাটে বা ডিম্বাকৃতি দ্যাখো তাহলে ধরেই নিও সেটি সুখোথাই রাজবংশের সময়ে তৈরি হয়েছিল।

সোনার বুদ্ধমূর্তি

সেই সময়টি এখনকার মত আধুনিক টেকনোলজির যুগ ছিল না যে দ্রষ্টব্যস্থানে ঢোকার আগে একবার উইকিতে চোখ বুলিয়ে নিলে কাজ চলে যায়, তাই সেদিন ওঁর ইতিহাসের জ্ঞান দেখেও আমরা খুব অবাক হয়েছিলাম। এখনকার প্রজন্মের বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই অবশ্য ইতিহাস বা জায়গাগুলি দেখার থেকে ছবিগুলোকে তাড়াতাড়ি ফেসবুকে পোস্ট করার ব্যাপারেই বেশি ব্যস্ত থাকেন। লাঠির ডগায় ক্যামেরা সেঁটে অন্যদের গুঁতো মেরে সেলফি তুলত তুলতেই এগিয়ে চলেন আর দ্রষ্টব্য স্থানগুলিকে সামনে থেকে দেখার সৌভাগ্য পেয়েও বঞ্চিত হন।
ফিরে গিয়ে আবার দেখা হবে সেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে মিঃ মুখার্জি সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বিদায় নিলেও তারপর যে দেড়বছর কলকাতায় ছিলাম ওঁর সঙ্গে আর একবারের বেশি দেখা হয় নি। কলকাতার এক অভিজাত এলাকায় ওঁর ফ্ল্যাটে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলাম আর সেখানেই উনি বলেছিলেন 'ভবিষ্যতে নানা জায়গা ঘুরতে ঘুরতে আমার মতো অনেক নতুন মানুষের সাথে তোমার আলাপ হবে, কিন্তু পথের আলাপ পথেই শেষ করে দিও। রাস্তায় অল্প সময়ে দেখে যাকে ভালোলাগে তাকে কাছ থেকে দেখলে ভালো নাও লাগতে পারে।' আমরা তাঁর কথা রেখেছিলাম। যদিও সেদিনের সেই মেয়েটি আজ এত বছর পরেও তার পথে আলাপ মিঃ মুখার্জিকে ভোলেনি।
পরেরদিন আমরা ব্যাংককের কাছে পাতায়া সি-বিচে গিয়েছিলাম। আজকের ঘিঞ্জি পাতায়ার সঙ্গে সেদিন সুন্দর পাতায়ার বহুদিক থেকেই অমিল। সে যুগে এদেশের প্রায় প্রতিটি সমুদ্রতটেই ছিল এক বিশেষ শ্রেণীর মেয়েদের আনাগোনা। ট্যাক্সিতেও বড় বড় অর্ধনগ্ন মেয়েদের ছবি রাখা থাকত আর প্রায় চতুর্দিকেই চোখে পড়ত বিদেশি ছেলের সঙ্গে হাত ধরে চলেছে এদেশীয় মেয়ে। ভাবতে অবাক লাগে তার মাত্র কয়েক মাস আগেও আমার আধা মফঃস্বলি মানসিক গঠনে তরুণ-তরুণীরা এক ঘরে থাকলেই তাদের বিবাহিত দম্পতি বলে ধরে নিতাম, তাই এখানে একটা মজার ঘটনা না জানিয়ে পারছি না। আমার স্বামী জাপান থেকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, 'কাজু হিকো' নামে ওঁর এক ঘনিষ্ট জাপানি বন্ধু কলকাতায় বেড়াতে যাচ্ছে তাই আমি যেন তাকে বাড়িতে ডেকে এনে যত্ন করে খাওয়াই আর কিছু ভালো উপহার দিই। একটি মেয়ে সমেত কাজুকে আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দেখেই অবধারিতভাবে তাকেই কাজুর বউ ধরে নিয়ে একটি ওয়াল হ্যাংগিং, ছোট নটরাজ মূর্তি আর দু প্যাকেট লপচু চা দিয়ে তাকে আপ্যায়ন করেছিলাম। উপহারগুলো পেয়ে তার 'বউ' আহ্লাদে আটখানা হয়ে কতবার আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলো সেই বর্ণনাসমেত চিঠি পেয়ে আমার স্বামীর তো একে,বারে মাথায় হাত। বউ তো দূরে থাক দুদিন আগেও কাজুহিকো মেয়েটিকে চিনতো না শুধু ভারতবর্ষ যাওয়ার খাতিরে তাকে সাময়িক ভাবে জুটিয়েছিল। অন্যদিকে আমার মা তখন কাজুকে হাত মুখ নাড়িয়ে লুচি খাওয়ার পদ্ধতিটা বোঝাচ্ছিলেন। কিন্তু তাতেও সে বাগে আনতে পারলোনা দেখে ধৈর্য্য হারিয়ে নিজেই মাঠে নেমে গেলেন। লম্বা বেগুনভাজাগুলোকে পুর হিসাবে ব্যবহার করে পাটিসাপটার স্টাইলে লুচি পাকিয়ে কাজুর মুখে গুঁজে দিতে লাগলেন আর তার সঙ্গে মুখে টপাটপ পড়তে লাগল আলুর দমের আলু। মা ছিলেন স্কুলের কড়া হেডমিস্ট্রেস্, তাই সেদিন কাজুহিকোর করুণ কাকুতিমিনতিও ওঁর হৃদয় স্পর্শ করতে পারেনি। তখন কি ছাই জানতাম যে জাপানিরা একেবারেই মিষ্টি পছন্দ করে না! সবশেষে এক বাটি কড়া রাবড়ি পেটে পড়ার পর তারা সেই যে বেগে আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল আর ওমুখো হয়নি।

সেবার ব্যাংকক থেকে প্লেন নিয়ে আমরা ফুকেৎ সি-বিচে গিয়েছিলাম, সে সময় ফুকেৎ ছিল অত্যন্ত ফাঁকা ফাঁকা। মনে আছে সাঁতার না জেনেও প্রচণ্ড জোরে স্পিড বোট চালাতে গিয়ে আমরা দুজনেই সমুদ্রে উল্টে পড়ি আর বেশ কিছুটা নোনা জল খাওয়ার পর লোকজন এসে আমাদের উদ্ধার করে। কিছু বছর আগে ফুকেতে 'ফ্যান্টসী' দেখতে গিয়েছিলাম যেখানে থাইল্যান্ডের দর্শনীয় স্থানগুলির মিনিয়েচার ভার্সান রাখা আছে আর তার সঙ্গে সারাক্ষণই চলেছে থাই নাচের প্রদর্শনী। এই ফুকেতেই আমি জীবনে প্রথমবার থাই মাসাজের আস্বাদ পাই। গোটা থাইল্যান্ড জুড়েই মাসাজের জায়গার ছড়াছড়ি আর তাদের পদ্ধতিও প্রায় এক। কোথাও সারা গায়ে গোলাপ জল ছিটিয়ে বা তেল মাখিয়ে মাসাজ করছে, কেউ বা পিঠে কড়কড়ে বালির মত পদার্থ ঢেলে ঝামা ঘষে যাচ্ছে আর কেউ কেউ বা ঠাণ্ডা দই আর সুগন্ধী মশলা ঢেলে সারা বডিটাকেই ম্যারিনেট করে দিচ্ছে।
মাত্র বছরখানেক আগে ব্যাংককের হেলথল্যান্ডে মাসাজের জন্য ঢুকেছিলাম। দুঃখের বিষয় সবার হাত সমান মোলায়েম নয়, আমারটি আবার দেখলাম বেশ কিছু বিভিন্ন সাইজের কাঠের হাতুড়ি নিয়ে সামনে বসে গেল। কখনও মাসাজের নামে কনুই দিয়ে গুঁতো মারে আর কখনও বা সাঁড়াশির মত আঙ্গুল দিয়ে হাত পা টানতে থাকে। মাঝে মধ্যেই শরীরের বিভিন্ন জয়েন্টগুলো হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে দিচ্ছিল আর আমিও প্রতিবার লাফিয়ে লাফিয়ে জানিয়ে দিচ্ছিলাম আমি তখনও জীবিত। এক সময় দেখি আমার পাশের মহিলার পিঠে একটি মেয়ে মাসাজের নামে নেচে

ফুকেৎ ফ্যান্টাসী

যাচ্ছে, পৃথিবীতে সবাই সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নয় যে পিঠে মানুষ চাপলো না মশা চাপলো তার তফাৎই ধরতে পারে না, তাই ভয়ে কোনও রকমে সেদিন আমারটিকে পিঠে ওঠা থেকে নিরস্ত করেছিলাম।

মাসকয়েক আগের ভ্রমণে প্রথমবার ব্যাংকক থেকে সাতশো কিলোমিটার উত্তরে চিয়াংমাই অঞ্চলটি দেখতে যাই। চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা হলেও এটি সমতলে অর্থাৎ ভ্যালিতে অবস্থিত। স্বপ্নেও ভাবিনি এখানে এরকম দলে দলে বিদেশি ছেলেমেয়েদের দেখতে পাব। তারা ঝাঁকে ঝাঁকে সাইকেল বা বাইক চালিয়ে আসছে আর রাস্তার ধারে বসে ফুর্তিতে থাই খাবার খেয়ে যাচ্ছে। অনেকে আবার ভাতের ওপর ক্ষিরের মত ঘন দুধ, আম আর বাদাম দেওয়া ম্যাংগো স্টিকি রাইস নিয়ে পথেই বসে গেছে। বেশিরভাগই জলের বদলে ডাব খাচ্ছে আর কেউ কেউ বা রামবুতান ফলটিকে মোচড় দিয়ে ঘুরিয়ে মুখে পুরছে। এই ফলটি খেলে মনে হবে একেবারে লিচু খাচ্ছেন। এছাড়া লাল ড্রাগন ফল, আম, আনারস, পেঁপে, ডাঁসা পেয়ারার তো ছড়াছড়ি। কয়েকটি আমেরিকান ছেলেকে জিজ্ঞাসা করাতে বলল, তারা বাইক নিয়ে পাহাড় ও জঙ্গলে ট্রেক করতে চলে যায়, এখান থেকে সমুদ্রের ধারে ক্রাবিতে যাবে আর সেখানে সপ্তাহখানেক কাটিয়ে তবে দেশে ফিরবে।

চিয়াংমাই-এ চারিদিকেই মন্দির তাই ছোটখাটো পোশাক পরে ভেতরে ঢোকা নিষিদ্ধ, সেফ সাইডে থাকার জন্য প্রায় প্রতিটি ট্যুরিষ্টই দেখলাম একটি করে পাতিয়ালা স্টাইলের হাতিয়ালা প্যান্ট কিনে নিয়েছে। পায়ের গোড়ায় জোরালো ইলাস্টিক্ থাকায় দৈত্যদানব থেকে লিলিপুট সবার পায়েরই কোনও না কোনও স্থানে সেটি চেপে বসে যাবে, লুটিয়ে পড়ার চান্স নেই। মধ্য প্রদেশের ওঠা নামা নিয়েও মাথা ঘামানোর ব্যাপার নেই কারণ কোমরে অপর্যাপ্ত কাপড় ও দড়ি সহ প্যান্টগুলি জাপানের 'সুমো' রেসলার থেকে স্বর্গতা 'মেরিলিন মনরো' সবার কোমরের কথা স্মরণে রেখেই তৈরি করা হয়েছে। এ একেবারে অল পারপাস্ ক্রিম। মন্দিরে ঢোকা থেকে হাতির পিঠে চাপা সবেতেই কাজে লেগে যাবে চিন্তা করে আমিও গোটা দুয়েক প্যান্ট কিনে নিলাম।

চিয়াং মাই

প্রায় আটশো বছর আগে লানা রজ পরিবার এই চিয়াংমাই শহরটি তৈরি করে। বার্মিজ আক্রমণের ভয়ে তারা প্রথমেই জায়গাটিকে উঁচু পাঁচিল আর পরিখা দিয়ে ঘিরে দেয়। এর ভেতরে প্রায় গোটা তিরিশেক বুদ্ধ মন্দির দেখা যায়। আমাদের দেশের পাড়ায় পাড়ায় শিবমন্দিরের মতো এখানেও দুপা এগোলেই একটি করে মন্দির আর সেগুলি লাল কালো পাথরের ওপর সোনালি কাজ দিয়ে সাজানো যা দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। এই মন্দিরগুলিতে রাস্তার কুকুরদেরও কেউ দূরছাই করেনা বরং তাদেরকে খুব যত্ন করে থালাতে খেতে দেয়। আমাদের দেশের মন্দিরের মত এখানে পান্ডাদের অত্যাচার নেই, তাই সেই সুন্দর শান্ত পরিবেশে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের স্তব শুনতে শুনতে আপনা থেকেই কেমন যেন শ্রদ্ধায় মাথাটা নত হয়ে আসে। আমেরিকান ছেলেমেয়েরাও দেখলাম হাঁটু মুড়ে হাতজোড় করে বুদ্ধ মূর্তিগুলির সামনে বসে আছে। এখানে একটি নির্দিষ্ট রুটে 'সংথাও' বা রেড ট্যাক্সি যাতায়াত করে আর সেরকমই একটি নিয়ে আমরা পরের দিন আধঘন্টা দূরে পাহাড়ের ওপর 'দয় সুতেপ' এর বুদ্ধ মন্দিরে পৌঁছে গেলাম। তিনশোটা সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ে ওঠার সময় মাঝে মধ্যেই মেঘ এসে শরীর ঢেকে দিচ্ছিল, তবে আমাদের বরাত ভালো কিছুক্ষণের মধ্যেই রোদ ওঠায় সেই সোনার রঙের মন্দিরগুলো যেন আলো পড়ে একেবারে ঝলমল করে উঠল। ঢোকার মুখে জুতো খোলার সময়ে একটু ভয়ে ভয়েই ছিলাম কারণ গতবার আদ্যাপীঠে আমার অমন সাধের চটিজোড়া কেউ নিমেষের মধ্যেই চক্ষুদান করে দেয়। এখানে সেটি হলে খালি পায়ে তিনশো সিঁড়ি নেমে আধ মাইল পাথুরে রাস্তায় হাঁটতে হবে চিন্তা করেই গায়ে জ্বর এসে গেল। অতএব ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করে জুতোজোড়াকে একটু দূরে সরিয়ে রাখলাম। শোনা যায় সাতশো বছর আগে একটি শ্বেত হস্তী এই পাহাড়ের ওপর এসে তিনবার ডেকে মারা যায়, তখনকার রাজা তেরশো তিরাশি সালে পাহাড়ের ওপর মন্দিরটি তৈরি করেন। চতুর্দিকে সোনালি রঙয়ের চাঁদোয়া, স্তুপ, অজস্র বুদ্ধ মূর্তি ও ছোট ছোট মন্দির নিয়ে জায়গাটি এক কথায় অত্যন্ত ঝলমলে। আমিও মোমবাতি জ্বালিয়ে ও একটি পদ্মফুল ভগবান বুদ্ধের পায়ে রেখে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বাইরে এসে দেখলাম আমার জুতোজোড়া স্বস্থানেই বিরাজ করছে।

চিয়াংমাই-এর চারিদিকেই পাহাড় আর জঙ্গল আর সেরকম একটি জায়গায় মেসা এলিফ্যান্ট ক্যাম্প। হাতিদের ফুটবল খেলা দেখে আনন্দ পেলেও সব থেকে অবাক হয়েছিলাম তাদের ছবি আঁকা দেখে। নিজের চোখে না দেখলে সেই সুন্দর গাছ ও ফুলের ছবিগুলি হাতির আঁকা বলে হয়ত বিশ্বাসও করতাম না। কারোর যদি জীবনে মাহুত হবার বাসনা থেকে থাকে তাহলে এখানে তিনঘন্টার একটি কোর্স নিয়ে সেই সখটাও মিটিয়ে নিতে পারেন। ট্যুরিষ্টরা প্রথমে হাতিগুলোকে ভালো করে খাইয়েদাইয়ে নদীতে স্নান করতে নিয়ে যাবেন আর সবশেষে হাতিগুলোর গায়ে ভালো করে পাঁক ও ধুলোর প্রলেপ লাগিয়ে তাদেরকে পোকার হাত থেকে বাঁচাতে সাহায্য করবেন। সকালে কয়েকটি আমেরিকান ছেলে-মেয়েকে সেখানে ঢুকতে দেখেছিলাম কিন্তু তিনঘন্টা পরে শ্বেতবর্ণ ছেলেমেয়েগুলিকে আপাদমস্তক কাদায় মোড়া ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণে রূপান্তরিত হতে দেখে আমার টেম্পোরারি মাহুত হবার বাসনা একেবারে পার্মানেন্টলিই উবে গেল। সেই পাহাড়ি অঞ্চলে হাতির পিঠে চেপেও এক বিপত্তি। হাতি পাহাড়ে উঠলে আমরাও পেছন দিকে হেলতে থাকি আবার খাদে নামলে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ি। সেখান থেকে গেলাম অর্কিড আর প্রজাপতির ক্যাম্পে। অর্কিডের যে এতরকমের রঙ হতে পারে এখানে না এলে হয়তো অজানাই থেকে যেত। পাহাড়, ঝরনা আর চারিদিকে ফুল নিয়ে জায়গাটা সত্যিই বড় সুন্দর। এর পাশেই বাঁদরদের ক্যাম্প ছিল কিন্তু আমার স্বামী পয়সা খরচ করে বাঁদর দেখতে রাজি হলেন না কারণ ওঁর গ্রামের বাড়িতে তেনারা প্রতিদিন ফ্রিতেই দর্শন দিয়ে যান। বাঘের ক্যাম্পও এখানে বিদ্যমান যদিও চালচলনে তারা বেড়ালেরই নামান্তর কারণ অতি অনায়াসে

মেসা এলিফ্যান্ট ক্যাম্পে হাতির ছবি আঁকা

তাদেরকে কোলে বসিয়ে মস্তক আঘ্রাণ করে মুখ চুম্বন করা যায়। অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন যে আফিম্-এর এফেক্টে তারা নাকি ঝিম মেরে থাকে।

এখানে বেশ কয়েকদিন থাকায় আমরা দুবেলাই 'গ্রিন বামবু' নামে একটি মাসাজের জায়গায় যাতায়াত শুরু করেছিলাম। নামটা যতই উৎকটই হোক একমাত্র এরাই আমাকে কোন বাঁশই দেয়নি। বশিষ্ঠ বা দুর্বাসা মুনির স্টাটাস না থাকলেও ঢোকার সঙ্গেসঙ্গেই বালি ও মধু দিয়ে আমাদের চরণযুগল ধুইয়ে দিত। এদের মাসাজের পদ্ধতি এতটাই আরামের যে কিছুক্ষণের মধ্যেই আশপাশের ঘর থেকে তীব্র নাসিকা ধ্বনি কানে আসত। আমি আবার এই মাসাজ-এর সময়ে ঘুমিয়ে পড়ার পক্ষপাতী ছিলাম না। দুবেলা যাতায়াত করাতে ওরা আমাদের দশ পার্সেন্ট করে ডিসকাউন্ট দিতে শুরু করেছিল, পাশের মহিলার দেখাদেখি আমিও আরও কিছুটা কমানোর ইচ্ছায় ছিলাম কিন্তু আমার স্বামী নিষেধ করলেন। ওঁর মতে বেশি বার্গেইন করতে গেলে হয় মাসাজের নামে ঠেঙিয়ে দেবে নয়ত সাঁড়াশির মত আঙুল দিয়ে গলা টিপে ধরবে। পৃথিবীতে কিছু কিছু ব্যাপারে নাকি একেবারেই বার্গেইন করা উচিত নয়!

দিন পাঁচেক চিয়াংমাই-এ কাটিয়ে ফিৎসানলো যাবার প্লেন ধরলাম। দিনে একটি মাত্র প্লেন সেখানে যায় তাই 'কান' এয়ার ছাড়া আর কোনও গতি নেই। প্লেনের সাইজ দেখে ভয়ে আমার মত প্রাণীরও মুখ বন্ধ হয়ে গেল। সিটের সংখ্যা দশ তারমধ্যে আবার প্রথম দুটি পাইলট ও কোপাইলটের জন্য সংরক্ষিত। পাইলটই আমাদের হাত থেকে ব্যাগগুলো নিয়ে পেছনে রেখে দিলেন। এমন সময় দেখি একটা লোক শাকপাতা সমেত একটি বোঁচকা হাতে প্লেনের গায়ে ধাক্কা মারছে। পাইলট চট করে ভেতরটা দেখে নিয়ে ফুল বলে জানিয়ে দিল অর্থাৎ দশজন হয়ে গেছে। অবশেষে প্রচুর আওয়াজ করে প্লেনটি যে হাইটে চলতে শুরু করল তাতে দেখলাম নীচে কিছু ছেলে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়াচ্ছে আর আমার পেছনে বসা বিদেশি মেয়েটি তাদের দিকে ফ্লাইং কিস্ ছুঁড়ে দিচ্ছে! চারদিকে পাহাড় থাকলেও তখনও ভ্যালিতেই ছিলাম তাই প্লেন কোন উচ্চতায় যাচ্ছে সেদিকে মাথা ঘামাইনি কিন্তু সামনে পাহাড় এগিয়ে আসতে দেখে রীতিমত ভড়কে গেলাম। পাশ থেকে আশ্বাসবাণী কানে এল 'ভয় নেই, পাহাড়ে গিয়ে গুঁতো মারবে না, দেখবে ঠিক টপকে যাবে'। হঠাৎ খেয়াল করলাম পাইলটের ঠিক পিছনেই একটা ষন্ডাগুন্ডা মত লোক বসে, দুজনের মধ্যে দরজা তো দূরের থাক কোনও কাঁচের ব্যবধানও নেই। আধা-ঘুমন্ত বেটার হাফকে ধাক্কা মেরে বললাম 'পেছনের ওই লোকটা যদি খুব জোরে পাইলটের মাথায় মারে তাহলে কী হবে'? ঘুমজড়িত কণ্ঠে আবার সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'কী আর হবে, তবে ও নিয়ে কিছু চিন্তা কোরো না তুমি, আসার আগে ছেলেকে কোথায় কী রাখা আছে খুব ভালো করে বুঝিয়ে এসেছি যাতে না ফিরলে কোনও অসুবিধাই না হয়' বলে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। অবশেষে আমাদের সেই পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মহাযাত্রাটি শেষ হল আর আমরাও এক পিস-এ ফিৎসানলো পৌঁছে গেলাম।

দয় সুতেপ বুদ্ধ মন্দিরের প্রবেশপথ

পরের দিন খান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে ইউনেসকো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ঐতিহাসিক সুখোথাই দেখতে গিয়েছিলাম। আটশো বছর আগে রাজা ইন্দ্রাদিত্যের আমলে এটাই ছিল থাইল্যান্ডের রাজধানী। তাঁর পুত্র রাজা রামখামহে-এর সময়ে জায়গাটি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। সে সময়ে প্রজারা এতটাই সুখে ছিল যে তারাই এই নগরটির নামকরণ করে 'সুখথাই'। সুখের কারণটিও সুন্দর লেখা আছে – সেদিন প্রজাদের পুকুরে মাছ ছিল, গোলাভরা ধান ছিল আর এই আমলে তারা কোন যুদ্ধবিগ্রহের মুখ দেখেনি তাই সবাই বড় সুখে শান্তিতে দিন কাটিয়েছিল। ব্যাংককে রাখা সেই চোখ ধাঁধানো সাড়ে পাঁচ টন সোনার বুদ্ধমূর্তিটিও এই রাজারই অবদান। সবুজ ঘাসে মোড়া আর বড় বড় গাছে ছাওয়া দু'কিলোমিটার বিস্তৃত ঐতিহাসিক জায়গাটি সত্যিই বড় স্নিগ্ধ। দূরে জলের ধারে আমগাছগুলির তলায় আজও বিশ্রাম নিচ্ছে গরুর দল, সব মিলিয়ে এ যেন এক আশ্রমের পরিবেশ। তারই মাঝে মাঝে ছড়িয়ে আছে বড় বড় বুদ্ধমূর্তি, অজস্র মন্দির আর রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। একদা যে স্থানে সোনার বুদ্ধের পুজো হত আজ তার ছাদ থেকে ঝোলে অসংখ্য বাদুড়, এর থেকে বড় ট্রাজেডি আর কি হতে পারে? আটশো বছর আগের সেই প্রাণবন্ত নগরীটি আজ যেন এক ঘুমন্ত পুরী। যদিও লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মতে, " As a well spent day brings happy sleep so a life well used brings happy death" - তবুও মনটা একটু ভারাক্রান্ত হয়েই রইল।

সব থেকে বেশি নজর কাড়ে মহাঠাট মন্দির। মন্দিরের বিশালতা এমনই যে ভগ্ন অবস্থাতে দেখলেও বিস্ময় লাগে! বিভিন্ন বুদ্ধমূর্তির সঙ্গে দুটি বারো মিটার উঁচু দাঁড়ানো বুদ্ধমূর্তিও চোখে পড়ে। একদা এখানেই ছিল রাজা ইন্দ্রাদিত্যের প্রাসাদ যা কিনা আজ প্রায় ধ্বংস। সেই ভগ্ন প্রাসাদে বসে আমিও যেন কল্পনায় সেদিনের সেই সুখোথাই-এর সুখী মানুষগুলিকে দেখতে পাচ্ছিলাম। তারা যেন ভালোবেসে আনন্দ করে ফুলের ডালি হাতে এগিয়ে চলেছে ভগবান বুদ্ধের মূর্তিকে শ্রদ্ধা জানাতে।

আজও তো সেই বৌদ্ধবিহারগুলি দাঁড়িয়ে আছে। শুধু সেদিনের সন্ন্যাসীরা নেই, একদা যাদের সুললিত কণ্ঠে আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হত সেই অতি পরিচিত সুর–

বুদ্ধং স্মরণং গচ্ছামি
ধম্মং স্মরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং স্মরণং গচ্ছামি...

সুখোথাই-এ মহাঠাট বিহার

~ থাইল্যান্ডের আরও ছবি ~

শ্রাবণী ব্যানার্জীর জন্ম ও বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির বাসিন্দা। বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি সঙ্গীতচর্চা ও ইতিহাস পাঠে জড়িয়ে আছে ভালবাসা। কৌতূহল এবং আনন্দের টানেই গত কুড়ি বছর ধরে বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত করে বেড়াচ্ছেন।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

দেবভূমির পবিত্রতায়

অয়ন দাস

~ কিন্নরের আরও ছবি ~

মাথায় হাত ছোঁয়ালেই সে ভস্ম হয়ে যাবে - কঠোর তপস্যার শেষে এই বর পেয়ে ভস্মাসুর পার্বতীকে পাওয়ার লোভে প্রথমে শিবের ওপরেই তা প্রয়োগ করতে গেল। ভস্মাসুরের হাত থেকে বাঁচতে শিব পালাতে পালাতে অবশেষে বিষ্ণুর স্মরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু নারী মূর্তি ধারণ করে কৌশলে অসুরকে নিজের মাথাতেই হাত ছোঁয়াতে বাধ্য করলে মারা পড়ল সে। ভস্মাসুরের হাত থেকে বাঁচতে শিব এই পর্বতে এসে বিষ্ণুর ধ্যান করেন। তাই এই পর্বতের নাম দেবভূমি যা কিন্নর কৈলাস নামে বেশি পরিচিত।

সাংলাতে রুপোলি পাহাড়ের সারি

জুন মাসের এক সোনালি সকালে চলেছি সাংলার উদ্দেশ্যে। শিমলা থেকে সাংলার দুরত্ব ৯০ কিমি। ২২নং জাতীয় সড়ক ধরে যেতে যেতে ভারতীয় সেনাদের মনে মনে কুর্নিশ করতেই হয় পাহাড় কেটে রাস্তা তৈরি করার এই অসাধ্য সাধনের জন্য। পথের দুপাশের দৃশ্য যেন ভিনসেন্ট ভ্যান গগের আঁকা অপূর্ব নিসর্গের ছবি। রাজেন্দ্রানীর মত যেন নিজের শরীরকে এলিয়ে দিয়েছে পাহাড়ি রাস্তা। দুপাশে পাইন,ফার,দেবদারু সহ অজস্র চিরহরিৎ বৃক্ষ। যেদিকে তাকাই শুধু সবুজ আর সবুজ। সবুজ পাহাড়কে যেন মায়ের মত আগলে রেখেছে ঘন নীল আকাশ। যেতে যেতে চোখে পড়ল শতদ্রু নদীকে কেন্দ্র করে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। শতদ্রু সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ২৫৮৯ মিটার উচ্চতায় ১৩০ কিমি পথ দিয়ে বয়ে চলেছে।
করছামে যখন পৌঁছলাম তখন পশ্চিমাকাশে রঙের পাগলাঘোড়া ছুটে চলেছে। সন্ধে হয় অনেক দেরিতে। রাস্তাঘাট বেশ বন্ধুর। পথ যেন আর শেষই হয়না, চলেছি তো চলেছি। দেখতে দেখতে শেষ হয়ে এল দিন। নির্জন গা ছমছমে পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে টিপটিপে বৃষ্টির মধ্যে তখনও এগিয়ে চলেছি। অবশেষে পৌঁছলাম সাংলা। কিন্তু হোটেলে ঢুকেই সারাদিনের ক্লান্তি কেটে গেল। একেবারেই ফাঁকা। ম্যানেজার থেকে কর্মচারী সকলেই বাঙালি। রিফ্রেস হয়ে বসতেই আমাদের হাতে গরম গরম পকোড়া আর কফির মাগ তুলে দিলেন।

পরদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে দেখি আমার জানলায় এসে হাজির হয়েছে বরফে ঢাকা সাদা পাহাড়। বরফের মাথায় দিনের প্রথম গোলাপি আলো এসে পড়ে এক অদ্ভুত পবিত্রতার সৃষ্টি করেছে। আর সমস্ত পাহাড় জোড়া ঘন নীল আকাশ তাকে সাদরে বরণ করছে। এক অপরিসীম আনন্দে সমস্ত শরীর-মন ভরে উঠল। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম সেই অনন্তযৌবনার দিকে।
হোটেলের পাশেই রয়েছে বসপা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প। ৯৫ কিমি লম্বা ও ২৫ কিমি চওড়া খরস্রোতা বসপা নদীর ওপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটি চালু হয়েছে ২০০৯ সালে।
সাংলা থেকে একঘন্টার রাস্তা ছিটকুল। ছিটকুলই হল তীব্বত সীমান্তে ভারতের শেষ গ্রাম। ৩৪৫০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই গ্রামে বাস করেন মাত্র ছশো মানুষ। এই অঞ্চলটি ডিসেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত বন্ধ থাকে। সেইসময় পুরো এলাকাটি ৫ ফুট বরফের তলায় চাপা পড়ে যায় এবং তাপমাত্রা নেমে যায় মাইনাস ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। মেঘরঙ আলোয় এক স্বপ্নের মত পাহাড়ি পথ ধরে এগিয়ে চললাম। উপত্যকায় চরে বেড়াচ্ছে ভেড়ার পাল আর তাদের পাহারা দিচ্ছে একটি বড়সড় চেহারার লোমশ পাহাড়ি কুকুর।
নয়নাভিরাম ছিটকুলে যেন ছবির মতোই দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি বৌদ্ধ গুম্ফা। দরজা এবং ছাদে কাঠের অপূর্ব কারুকার্য। মহান কোনও শিল্পী ছাড়া এমন কাজ অসম্ভব! অনেক নীচে কিশোরীর মত প্রবল উৎসাহে বয়ে চলেছে চিরসবুজ বসপা নদী। মাথার ওপরে ঘন নীল আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা মেঘের ভেলা। সমস্ত ছিটকুলকে পিতার মত আগলে রেখেছে বরফে ঢাকা হিমালয় পর্বতমালা। ঠিক যেন এক একজন ধ্যানমগ্ন ঋষি। বসপা নদীর বয়ে চলার সুরেলা গান ছাড়া এখানে আর কোনও শব্দ নেই। অসম্ভব পবিত্র আর শান্তির এই পরিবেশে শরীর-মনে বড় আরাম লাগতে লাগল। পাথরের ওপর শুয়ে পড়ে বরফ ঠান্ডা বসপাকে আদর করতে লাগলাম।

ছিটকুল থেকে তিন ঘন্টার পথ কল্পা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৭৫৯ মিটার উচ্চতায়। সমগ্র কল্পা জুড়ে ধ্যানমগ্ন যোগীর মত বিরাজ করছে কিন্নর কৈলাশ পিক (৬৫০০মিটার), ফাওয়ারাং পিক (৬৩৪৯মিটার), জোর কাডেন পিক (৬৪৭৪ মিটার) এবং সারা পিক (৬০৮০মিটার)। কিন্নর কৈলাস পিকের ওপর

ছিটকুলে

রয়েছে ২০০০০ ফুট উচ্চতায় ৭৯ ফুট লম্বা এক পাথরখণ্ড যা দেখতে অনেকটা শিবলিঙ্গের মত - প্রকৃতির এক বিস্ময়। কথিত আছে ওইখানে বসেই নাকি ধ্যান করেছিলেন দেবাদিদেব। গ্রীষ্মকালে প্রতিবছর পুণ্যার্থীরা আসেন শিবলিঙ্গ পরিক্রমায়। ঝকঝকে সোনাঝরা রোদ পড়ে সেই শ্বেতশুভ্র পাহাড় শ্রেণীগুলি যেন হীরকখন্ডের মত দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। আপেল বাগানের মধ্যে বসে রূপসী কিন্নরের সেই অপার বিস্ময়ের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন সম্মোহিত হয়ে পড়ি। অপরূপ এই স্থানে বিরাজ করছে এক অপার শান্তি। আমার শহুরে মন থেকে স্বার্থপরতা, কলুষতা, নীচতা জীর্ণ পাতার মত যেন ঝরে যায়। মনে হতে থাকে যেন রক্তমাংসের পৃথিবীতে নয়, আমি রয়েছি কোনো এক পবিত্র দেবভূমিতে।

কল্পাতে

ছিটকুলে বসপা নদী খেলা করে নুড়ি পাথরের সাথে

~ কিন্নরের আরও ছবি ~

পেশায় চাকুরে অয়ন দাসের নেশা লেখা। তাঁর মনে হয় একজন ভ্রমণ লেখকের মূল কাজই হল মানুষকে প্রকৃতির কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া - ঘরে বসেও যাতে সে বেড়ানোর আনন্দ পায়। প্রকাশিত বই -'দুপায়ে দুনিয়া'।